# তিরিশ লাখের তেলেসমাত

জহুরী

আসিফ প্রকাশনী

# তিরিশ লাখের তেলেসমাত

জহুরী

আসিফ প্রকাশনী

www.pathagar.com

- **ভিয়েতনামে** ১২ বছরের যুদ্ধে সকলপক্ষের সৈন্য ও লোকজন নিহত হয় ১২, ৫২, ৯৭৭ জন।
- **আলজিরীয়ায়** শেষ দিকের ৭/৮ বছরের মুক্তি যুদ্ধে ১০ লাখ আলজিরিয়াবাসী নিহত হয়।
- **লেবাননে** সাধারণ যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ চলছে বিগত ১৭ বছর থেকে। নিহতদের সংখ্যা এখনও দেড়লাখ অতিক্রম করেনি।
- **কম্বোডিয়ায়** ১৯৭০ সাল থেকে গৃহযুদ্ধ চলছে। এ দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে পলপটের ১০ লাখ সহ ২১ লাখ লোক নিহত হয়েছে।
- **আফগানিস্তানে**১৪ বছরের যুদ্ধে ২০ লাখ লোকের প্রাণ হানি ঘটে।
- **ইরান—ইরাক** যুদ্ধে ৯ বছরে উভয় পক্ষের আহত ও নিহত মিলিয়ে সংখ্যা ১০ লাখ।
- **এঙ্গোলায়** ১৬ বছরের গৃহযুদ্ধে ৩ লাখ এঙ্গোলাবাসী প্রাণ হারিয়েছে।
- **শ্রীলংকায়** ১৯৮১ সাল থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখন ও যুদ্ধ চলছে; কিন্তু এখনও সে দেশের এক লাখ লোকও প্রাণ হারায়নি।

এসব যুদ্ধে অত্যাধুনিক সবরকমের অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এখনও কোন কোন যুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে; কিন্তু দীর্ঘ দিনের কোন যুদ্ধেই ৩০ লাখ লোক প্রাণ হারায়নি।

আমাদের ৮ মাস ৭ দিনের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ নিহত হওয়া কি সম্ভব? '৩০ লাখ' সংখ্যাটি কি একটা তেলেসমাত নয়? **এই তেলেসমাত কাহিনীর দলিল—প্রমাণ রয়েছে পুস্তকের অভ্যন্তরে।**

www.pathagar.com

তোমরা জেনেশুনে সত্যকে গোপন করোনা এবং সত্য—মিথ্যার সংমিশ্রণ করোনা।

—সূরা বাকারাহ

www.pathagar.com

তিরিশ লাখের তেলেসমাত
জহুরী

**প্রকাশক**
মুহাম্মদ মতিউর রহমান
আসিফ প্রকাশনী
৩৮/২ (খ) বাংলাবাজার, ঢাকা

**সহযোগিতায়**
শাহানুর লাইব্রেরী
৩৮/২ (খ) বাংলাবাজার, ঢাকা

**বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণ**
কমপিউটার ল্যাব
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা

**দাম**
সাদা–১৮·০০
ডলার–১·০০

TIRISH LAKHER TELESMAT
BY: JAHURY

**PUBLISHED BY**
MD. MOTIUR RAHMAN
ASIF PROKASHONI
38/2 (KHA) BANGLABAZAR. DHAKA.

**CO-OPERATED BY**
SHAHNOOR PROKASHONI
38/2 (KHA) BANGLABAZAR. DHAKA.

**COMPOSED & PRINTED AT**
COMPUTER LAB
38/2 BANGLABAZAR. DHAKA.

**PRICE**
TK.18.00 (WHITE)
$ 1.00

www.pathagar.com

নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা
দৈনিক মিল্লাতের সম্পাদক
'অপ্রিয় হলেও বলা দরকার' শীর্ষক
কলামের জনপ্রিয় লেখক
নীতি আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষহীন কলম-যোদ্ধা
**জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক** -এর
সাহসী হাতে 'তিরিশ লাখের তেলেসমাত'
পুস্তক খানা তুলে দিলাম

www.pathagar.com

## প্রাপ্তিস্থান

**আধুনিক প্রকাশনী**
২৫, শিরীষ দাস লেন
ঢাকা – ১১০০

**মদীনা পাবলিকেশান্স**
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা – ১১০০

**আশা প্রকাশনী**
ওয়ারলেস রেল গেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

**প্রফেসার্স বুক কর্ণার**
১৯১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

**আসিফ প্রকাশনীর অন্য বই**

- আদর্শ মানব গঠনে অভিভাবকের ভূমিকা

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

আসিফ প্রকাশনী তার প্রথম অবদান 'তিরিশ লাখের তেলেসমাত' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছে। প্রকাশক হিসাবে আত্মপ্রকাশের দূরতম বা প্রচ্ছন্ন চিন্তাও কোন সময় মনে আসে নি। হঠাৎ করেই হাসিচ্ছলে জহুরী সাহেবের 'তিরিশ লাখের তেলেসমাত' প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করি। জহুরী সাহেব আমার আগ্রহে সাড়া দিয়ে তাঁর বই প্রকাশের দায়িত্ব দেন এবং সার্বিক ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেন।

আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও সুদীর্ঘ ২১ বছর যাবত যে মহা–সত্যটি মিথ্যার আবরণে ঢাকা ছিল, তা আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব, এই ছিল 'তিরিশ লাখের তেলেসমাত' প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ।

বর্তমান অবস্থায় সত্যকে সঠিক রূপে প্রকাশ করার বলিষ্ঠ সাহসের অভাব। মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা এতদিন মিথ্যার আবরনে ঢাকা পড়ে থাকে। জহুরী সাহেবের সহযোগিতায় সত্যকে মিথ্যার আবরণ থেকে মুক্ত করে দেশবাসীর কাছে পেশ করলাম। এই সত্যকে তুলে ধরে ঘুমন্ত মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার সময় এসেছে। জহুরী সাহেব তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা যুক্তি–নির্ভর তথ্যের মাধ্য–মে যে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন, তা থেকে পাঠক সমাজ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি মনে করি।

আসিফ প্রকাশনীর পক্ষে

**মুহাম্মদ মতিউর রহমান**

www.pathagar.com

# লেখকের কথা

"আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে আর ২ লাখ নারী সতীত্ব হারিয়েছে"- এই সংখ্যাদ্বয় বহুল আলোচিত; কিন্তু পরিকল্পিত অনুমানের দুষ্ট মগজ থেকে সৃষ্ট। এই 'তিরিশ লাখ' সত্যিই এক তেলেসমাত। এমন তেলেসমাত সৃষ্টি করে যারা অনেককে সম্মোহিত করে স্তাবক বানিয়ে রেখেছেন, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্তাবক হয়ে যারা 'তিরিশ লাখ' 'তিরিশ লাখ' আওড়াচ্ছেন, তাদের উচিত হবে তিরিশ লাখের ভেদ-হকিকত জানা এবং এ তেলেসমাত সৃষ্টিকারীদের চেহারা ও চরিত্র চিনে রাখা। যদি এই অন্ধ স্তাবকতার নেশা কাটে, তাহলে নিজেদের ভুল শোধরানো উচিত। ভুলকে চিরকাল কোলে তুলে রাখা যায় না, সংশোধন ছাড়া স্থায়ী আসনও দেয়া যায় না। সংশোধন প্রয়াসে ইজ্জতের কোন লয়-ক্ষয় হয় না; বরং তাতে ইজ্জত আরও বাড়ে, হৃদয়ের উদারতার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাতীয় আদর্শ ও দর্শনের ভুল ৭৪ বছর পর সংশোধন করে। কমিউনিজম যে একটা ভুল মতবাদ বা দর্শন, তা ইউনিয়নের সকল প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা একই বৈঠকে বসে ঘোষণা করেন। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে সত্য উপলব্ধির এই বাস্তব প্রয়াস তাদের হৃদয়ের উদারতাকে সংকোচিত করেনি; বরং প্রশস্ত করেছে। তাদের পক্ষে যদি এতবড় একটা ভুলের সংশোধন করা সম্ভব হয়, যে ভুলের মধ্যে একটি অণুকণাও শুদ্ধ ছিল না, তাহলে আমরা তিরিশ লাখের এই ভুলকে কেন সংশোধন করতে পারবো না? আমাদের এই ভুলে কিছুটা হলেও শুদ্ধ অংশ আছে। লাখ লাখের হিসাবে ভুল হলেও হাজারে হাজারের হিসাবে তো ভুল নেই। কিন্তু ভুল সংশোধনের কোন প্রয়াস অতীতেও ছিলো না এবং এখনও নেই। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিহতদের আর সতীত্বহারা নারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত ভুল স্থায়ীভাবে থেকেই গেল। আমাদের উচিত হবে এ ভুলের সংশোধন করা এবং যারা এর জন্মদাতা তাদের চিনে রাখা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক সমরবিশারদ তাদের অবসর জীবনে নিজ নিজ সমর অভিজ্ঞতাকে বই-পুস্তক লিখে ধরে রেখেছেন। বৃটেন এবং আমেরিকার কয়েকজন

www.pathagar.com

জেনারেল এ বিষয়ের উপর কয়েকখানা চমৎকার বই লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের লেখা দু'চারখানা বই পড়ার।

আমেরিকার এক জেনারেল যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি এবং মানুষ ও পশু হতাহতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি সেই বিস্তারিত আলোচনার সারাংশ এখানে সংযোজন করলাম। তিনি লিখেছেনঃ ধরা যাক, প্রায় সমানে সমান শক্তিশালী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এমন যুদ্ধে আমরা কি দেখি? ঝাঁকে ঝাঁকে দু'পক্ষের যুদ্ধ বিমান আকাশে উড়ে। স্ব-স্ব নৌবহরও সমুদ্রের পানি মন্থন করে শত্রুর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়। আকাশে ও পানিতে দু'পক্ষই প্রচন্ড আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ একে অন্যের বিরুদ্ধে চালিয়ে থাকেন। যার কাছে যত ট্যাংক আছে তা ব্যবহার হয় বিজয়ের লক্ষ্যে। কামান ও মেশিনগান থেকে লাখে লাখে গোলাগুলী বর্ষিত হয়। যুদ্ধে কোন্ দেশ জয়ী হলো আর কোন্ দেশ বিজিত হলো তা নির্ধারিত হলেও এ কথা মানতে হবে, যে দেশ জয়ী হয়েছে সেই দেশ অনেক কিছু হারিয়েই জয়ী হয়েছে। অপরপক্ষে, যে দেশ পরাজিত হয়েছে সেই দেশও পরাজিত হয়েছে নিজের অনেক কিছু হারিয়ে এবং শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। যুদ্ধের আর একটি বিশেষ দিক আছে, যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। সেই দিকটি হলো মানুষ হতাহতের দিক। উভয় দেশের বিমান, নৌজাহাজ, ট্যাংক, কামান, মেশিনগান, রাইফেল এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে যত বোমা ও গোলাগুলী বর্ষিত হয়, এর সংখ্যা ও পরিমাণ যোগ করলে এবং এসবের ধ্বংস শক্তি নিরূপণ করলে সে পরিসংখ্যান দেখে যেকোন সচেতন সাধারণ মানুষও বলবেন, এই বিবদমান দুটি দেশ ভস্মে পরিণত হওয়ার মত বোমা ও গোলাগুলী একে অন্যে বর্ষণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা যায়, দুটি দেশই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, লোকজনও হারিয়েছে অনেক, কিন্তু কোন দেশই বিরান হয়নি। দেশের জনসংখ্যার এক-দশমাংশও নিহত হয়নি। এর কারণ, যুদ্ধে যত গর্জন হয় তত বর্ষণ হলেও ব্যর্থ ও লক্ষ্যচ্যুত বর্ষণ হয় অনেক বেশী।


www.pathagar.com

এই জেনারেলের অভিজ্ঞতাভিত্তিক মন্তব্য শতে শত ভাগ সঠিক। তিনি কয়েকটি যুদ্ধের গর্জন ও বর্ষণ এবং নিহতদের পরিসংখ্যান পেশ করে নিজের মন্তব্য যে সঠিক তা প্রমাণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত বিভিন্ন সময়ের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা, স্মরণ করতে পারি। প্রায়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বন্দুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নানা কারণ সৃষ্টি করে। তাদের কোন কোন বন্দুক যুদ্ধ ১১/১২ ঘন্টা পর্যন্ত চলে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এসব যুদ্ধে ৫ শত থেকে ৮/১০ হাজার রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়। বোমা যে কত ফাটে তার তো কোন হিসাবই রাখা হয় না। যেকোন একজনকে শেষ করার জন্য একটি গুলীতেই রয়েছে সেই ধ্বংস ক্ষমতা। যত রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয় ততজন তো এ হিসাবে মরার কথা। কিন্তু পরদিন পত্র-পত্রিকায় খবরও প্রকাশিত হয় যে, ১১/১২ ঘন্টা দু'দল ছাত্রের মধ্যে প্রচন্ড বন্দুক যুদ্ধ ঘটে, তাতে ৮/১০ হাজার রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়। এ যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছে, ১০ জন হয়েছে আহত। কি আশ্চর্য। হাজার হাজার গুলীতে মরে ১ জন বা ২ জন, কোন কোন ক্ষেত্রে একজনও মরে না। তাহলে ধরে নিতে হয়, সব গুলীই লক্ষ্যচ্যুত।

যুদ্ধক্ষেত্রে বোমাবর্ষণে আর গুলীবর্ষণে মানুষ হতাহতের এই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন যে দেশের মুক্তিযুদ্ধে কোন যুদ্ধ বিমান ব্যবহার হয়নি বললেই চলে, নৌবাহিনীর জাহাজও নোঙর তোলেনি, সম্মুখযুদ্ধে মোকাবেলাও তেমন একটা হয়নি, শুধু গেরিলা যুদ্ধে ৮ মাস ২১ দিনে ৩০ লাখ লোক কিভাবে নিহত হতে পারে তা আমার বুঝে আসছে না। ২ লাখ নারীইবা সতীত্ব হারালো কিভাবে, সেই রহস্যও বোধগম্য হবার নয়। ২ লাখ নারীর সতীত্ব হারালে দু'লাখ না হোক অন্তত একলাখ পাক-সেনার দরকার। কিন্তু এই সংখ্যক পাক-সৈন্য কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন ছিল? সরকারী হিসাবে দেখা যায়, পাক-সেনা ও তাদের সমর্থক সিভিল লোকের সংখ্যা মাত্র ৯৩ হাজার ছিল, যাদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে ভারতে নেয়া হয়। যারা দু'লাখ নারীর সতীত্বহানির দুন্দুভি বাজায়, তাদের জিজ্ঞাসা করি, এই ৯৩ হাজারের সকলেই কি সতীত্বহানির কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিল? তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায়, তাদের প্রতেকেই এই অপকর্মে লিপ্ত ও ব্যস্ত ছিল, তাহলে



www.pathagar.com

আবার প্রশ্ন রাখি, ৩০ লাখ লোক নিধনের কাজটা তারা কখন করল? একই সময়ে কি তারা ডবল ডিউটি করেছে? কি যুক্তি আছে এই ৩০ লাখের ঘোষকদের কাছে?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মেয়াদ সর্বমোট কতদিন ছিল? সাধারণ হিসাবে এ মেয়াদ ছিল মাত্র ৮ মাস ২১ দিন। ২৫ শে মার্চের মধ্যরাত থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল। ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত-এর অর্থ হলো ২৬ শে মার্চ। ২৬ শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গণনা করলে ৮ মাস ২১ দিন হয়। কিন্তু নির্ভুল হিসাব কষলে মুক্তিযুদ্ধের মেয়াদ ৮ মাস ২১ দিন না হয়ে বরং ৮ মাস ৭ দিন হয়। কারণ, প্রথম দু'সপ্তাহ পাকবাহিনী কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদেরকে সংগঠিত করতে দু'সপ্তাহ সময় নেয়। এই দু'সপ্তাহ পর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের সেনা কমান্ডের অধীনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রথম দিকে পাকবাহিনীর কয়েকখানা বিমান আকাশে উড়ে আগরতলার আশেপাশে বোমাবর্ষণ করে ফিরে আসে। জবাবে ভারতেরও কয়েকখানা বিমান সীমান্তবর্তী কয়েক স্থানে বোমাবর্ষণ করে। এই হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দু'সপ্তাহের বিমান যুদ্ধের অবস্থা। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দু'সপ্তাহে অর্থাৎ, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকা বিমান বন্দরসহ কয়েক স্থানে ভারতীয় কয়েকখানা বিমান বিনাবাধায় বোমাবর্ষণ করে। এ সময় পাকিস্তানের একখানা বিমানও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে উড়েনি। এসবকে যদি বিমান যুদ্ধ বলা যায়, তাহলে এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ৩০ জনও ছিল না। নৌযুদ্ধ আর ট্যাংক যুদ্ধ তো মোটেই হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু বন্দুক যুদ্ধ। এলএমজি আর স্টেনগানই ছিল এই যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার। এমন একটা যুদ্ধে ৮ মাস ৭ দিনে ৩০ লাখ লোক কি নিহত হতে পারে? অথচ এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৫ দিন পর থেকেই ৩০ লাখ লোক নিহত হওয়ার প্রচার শুরু হয়ে যায়। কারা এই ৩০ লাখের হিসাব কষল, কারা জরিপ করে এই সংখ্যা বের করে উপহার দিল, তা কেউ জানে না। ১৯৭১ সালের ২২ শে ডিসেম্বর একটি দৈনিকের সম্পাদকীয়তে ৩০ লাখের উল্লেখ থাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই 'ইউরেকা ইউরেকা' বলে বিশেষ একটি মহল লাফাতে শুরু করেন। জানতে চেষ্টা করা হয়নি এই পত্রিকা আর পত্রিকা সম্পাদক সাহেবের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধে কি


www.pathagar.com

ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত '৩০ লাখ' সংখ্যাটি নিয়ে যারা লাফালাফি শুরু করলেন, তাদের বিরুদ্ধেই ৯ মাস পত্রিকাটি 'বিশেষ ভূমিকা' পালন করে। আলোচ্য পত্রিকাটির মালিকের নাগরিকত্ব পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পর পরই কেড়ে নেয়া হয়। এই মালিকের মালিকানাধীন পত্রিকার প্রিয়ভাজন সম্পাদক ৩০ লাখ সংখ্যাটি নিজের ৯ মাসের পাপ স্খালনের জন্য উপহার দিলেন; আর আওয়ামী-বাকশালীরা এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান পর্যন্ত তা গ্রহণ করে নিলেন। কি নির্লজ্জ বৈপরীত্য! শত্রুর কথাই কবুল, কি অপূর্ব সুবিধাবাদী নীতি! তারা সেই 'কবুল'কে কবুল করে মিথ্যা সংখ্যার সঙ্গে 'নিকাহ' বসলেন। সে সময় থেকেই শুরু হয় ৩০ লাখের উচ্চারণ। আজও তা চলছে গল্পের সেই সংক্রামক কান্নার মত, যারা 'লসমন মর গিয়া' শুনামাত্রই কাঁদতে শুরু করেন। সেই গল্পটি সংক্ষেপে বলছি।

'লসমান মর গিয়া'- এই দুঃসংবাদ রাজার কানে পৌঁছামাত্র রাজা লসমন শোকে কেঁদেই ফেলেন। রাজার কান্না দেখে তার প্রধান উজিরও কাঁদেন। প্রধান উজিরের কান্না দেখে অন্যান্য উজিরও 'হায় লসমন হায় লসমন' বলে বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। উজিরদের কান্না দেখে শহর কোতোয়াল কাঁদেন। তাঁর কান্না দেখে পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজরাও কাঁদেন। এভাবে রাজ্যের প্রত্যেকেই 'হায় লসমন হায় লসমন' বলে কাঁদতে থাকেন। সংক্রামক ব্যাধির মত এ কান্নাও রাজ্যের প্রত্যেককে আক্রান্ত করে। গণ-কান্নার এই দৃশ্য দেখে রাজ্যের এক প্রবীণ শুধু হাসতে থাকেন। এ সংবাদ গেল রাজার কানে। রাজা তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালকে ডেকে বললেন, এই ঠিকানায় এক বুড়ো লোক আছে। রাজ্যের সবাই যখন কাঁদছে, তখন এই বুড়ো শুধু হাসছে। তাকে এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা কর। কোতোয়াল 'জি জাহাঁপনা' বলে প্রস্থান করলেন। কোতোয়ালের লোকজন বুড়োকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা করলো, বল তো বুড়ো তোমার কি হয়েছে? রাজ্যের সবাই লসমনের শোকে কাঁদছে, কিন্তু তুমি কেন কাঁদছ না? বুড়ো পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমরা তো লসমনের জন্য কাঁদছো, বল তো লসমন কে? কোতোয়ালের লোকজন বলল, তা তো আমরা জানি না। বুড়ো বলল, কান্নার কারণ না জেনে কেন কাঁদছো? তোমরা আহাম্মক। আগে কারণ জান, তারপরে কাঁদ। কোতোয়ালের লোকজন কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা


www.pathagar.com

করলো, লসমন কে? কোতোয়াল বললেন, তা তো আমি জানি না। কোতোয়াল জিজ্ঞাসা করলেন উজিরদের। বলুন তো লসমন কে? উজিররা বললেন, তা তো আমরা জানি না। উজিররা জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান উজিরকে? তিনিও বললেন, তা তো আমি জানি না। প্রধান উজির রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জাহাঁপনা, কে এই লসমন, যার জন্য আমরা এত কাঁদলাম? রাজা মুচকি হেসে জবাব দিলেন, লসমন আমার এক গাধার নাম, যে রাজপরিবারের কাপড় ধোপার বাড়ীতে বহন করে নিয়ে যেত। সেই লসমন গাধাটি মরে গেছে। তাই একটু কেঁদেছিলাম। কিন্তু তোমরা কাঁদলে কেন? প্রধান উজির বললেন, রাজা কাঁদলে প্রজারা কি না কেঁদে পারে জাহাঁপনা? রাজা বললেন, তোমরা রাজার কান্না দেখে শুধু কেঁদেছ, কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করোনি। এটা তোমাদের বোকামি হয়েছে বটে, কিন্তু তোমরা যে আমার অনুগত প্রজা, সে প্রমাণে আমি সন্তুষ্ট। আনুগত্য এরই নাম।

ঐ লসমন শোকের ব্যাধির মত প্রত্যেকের মুখে মুখে তিরিশ লাখ উচ্চারিত হতে থাকে। কেউ জিজ্ঞাসা করেনি এবং জানতেও চায়নি, এই সংখ্যাটি কোন্ ফ্যাক্টরীতে তৈরী হয়ে বাজারজাত হলো? শেখ মুজিবুর রহমান যদি এই সংখ্যাটির প্রথম ম্যানুফ্যাকচারার হতেন, তাহলে হয়তো মনে করতাম, এই জাহাঁপনার প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আগেই যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সংখ্যাটি গ্রহণ করা হয়েছে। লসমনের কাহিনীতে রাজা প্রথম কেঁদেছিলেন। এখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম ম্যনুফ্যাকচারার হিসাবে রাজ-আনুগত্যের খাতিরে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ৩০ লাখের কাহিনীতে লসমনের রাজার মত শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম নন। এর প্রথম ম্যানুফ্যাকচারার হচ্ছেন একজন পত্রিকা সম্পাদক। এই উৎপাদনের মান নির্ণয় করে সার্টিফিকেটদানকারী হলো প্রাভদার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। প্রাভদায় প্রকাশিত এই সংবাদটি হচ্ছে ঐ ঘোষকদের জন্য অনন্য এক সার্টিফিকেট বিশেষ। শেখ মুজিবুর রহমানকে বলতে পারেন এই ৩০ লাখ সংখ্যাটির বাজারজাতকরণ- প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্বোধনকারী। অথচ আনুগত্যের ফুলের মালা দেয়া হলো ঐ পত্রিকা সম্পাদকের গলায়।


www.pathagar.com

লসমন ছিল রক্ত-মাংসের এক প্রাণী। আদরের গাধার মৃত্যুতে রাজার শোকাহত হয়ে কান্না স্বাভাবিক, কিন্তু এই ৩০ লাখ তো বাস্তব ও সঠিক সংখ্যার ধারে-কাছেও ছিল না। এটা ছিল আমাদের স্বদেশী সম্পাদক আর প্রাভদার ঢাকাস্থ সংবাদদাতার দুষ্ট মগজে তৈরী একটি সংখ্যা। এমন একটা বানোয়াট সংখ্যাকে আমাদের আলোচ্য সম্পাদক সাহেব তাঁর কাগজে পরিবেশন করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এ জন্য আমি এই ৩০ লাখের সংখ্যাকে একটি 'তেলেসমাত' বলেছি।

'তিরিশ লাখের তেলেসমাত' সম্পর্কে এই পুস্তকে আমি তথ্য-প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোচনা করেছি। আমি এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে এ তথ্যেরই উদ্ধৃতি দিব যে, সেসব দেশে মুক্তিযুদ্ধ কতদিন চলেছিল, কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কত লোক নিহত হয়েছিল। এসব তথ্যের আলোকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব যে, আমাদের দেশে যতদিন মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল এবং যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতে তিরিশ লাখ লোক নিহত হওয়া সম্ভব কিনা।

**ভিয়েতনাম**— ১৯৪০ সালে জাপান কর্তৃক ভিয়েতনাম দখলের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৪ সালের ২১ শে জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ভিয়েতনামে যে মুক্তি আন্দোলন চলে এবং যে লোক ক্ষয় হয়, সে ইতিহাসও আমি এখানে উল্লেখ করছি না। এমনকি ১৯৬৩ সালে ভিয়েতনামে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং একই বছরের মধ্যে যে কয়টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে; আর তাতে যত লোক হতাহত হয়, সে হিসাবও আমি এখানে পরিবেশন করছি না। ১৯৬৪ সালে আমেরিকা সরাসরি ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সে সময় থেকে ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস, তা থেকে কিছু তথ্য পেশ করছি।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৫,৪৩,৪০০ জন আমেরিকান সৈন্য ভিয়েতনামে মোতায়েন করা হয়। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার নিক্সন সরকার ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়া ১৯৬৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৭২ সালে আমেরিকা আবার প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করে ভিয়েতনামে। ১৯৭৩ সালের ২৭ শে জানুয়ারী উত্তর ও দক্ষিণ


www.pathagar.com

ভিয়েতনাম এবং ভিয়েতকংদের সঙ্গে আমেরিকা প্যারিসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। আরও দু'বছর চলে প্রচন্ড যুদ্ধ। ১৯৭৫ সালের ৩০ শে এপ্রিল সায়গনের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলে কত বছর? এ প্রশ্নের উত্তর একটু কঠিন বৈকি? যদি ১৯৫৬ সন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে ধরা যায়, তাহলে ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল ২০ বছর। তবে ১৯৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই যুদ্ধ দুই ভিয়েতনামের মধ্যেই চলেছিল। আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটে ১৯৬৪ সালে। সে সময় থেকে গণনা করলে মুক্তিযুদ্ধের মেয়াদ দাঁড়ায় ১২ বছর। এই ১২ বছরের যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল–

| | |
|---|---|
| আমেরিকার সৈন্য নিহত হয়েছে | ৪৭,৭৫২ জন |
| দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য নিহত হয়েছে | ২,০০,০০০ " |
| অন্যান্য মিত্রবাহিনীর সৈন্য নিহত হয়েছে | ৫,২২৫ " |
| উভয় ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধাসহ সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছে | ১০,০০,০০০ " |
| মোট নিহতদের সংখ্যা | ১২,৫২,৯৭৭ জন |

অর্থাৎ, বছরের হিসাবটাই এখানে যথেষ্ট নয়, এই যুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এমন কোন অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিল না, যা এই যুদ্ধে আমেরিকা ব্যবহার করেনি। হাজার হাজার টন বোমাবর্ষণ করেছে আমেরিকা। দুই পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। অথচ এক যুগের এই যুদ্ধে সকল পক্ষের ১২ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৭ জন সৈন্য ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়।

**আলজিরিয়া–** আলজিরিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল আমার হিসাবমতে ১৩২ বছর। অর্থাৎ, ১৮৩০ থেকে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্স ৩০ সহস্রাধিক সৈন্য পাঠিয়ে আলজিরিয়া দখল করে নেয়। আমীর আবদুল করিমের নেতৃত্বে জনগণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে। তিনি ১৮৪৭ সালে গ্রেফতার হন। ১৮৫৬–৫৭ সালে আলজিরিয়াবাসী ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ করে। ১৮৬৪ সালে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান আলজিরিয়াকে


www.pathagar.com

ফ্রান্সের একটি প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৪৫ সালে ফরাসী সৈন্য আলজিরীয়দের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলী করে এবং গ্রামে-গঞ্জে ফরাসী সৈন্যরা প্রবেশ করে নির্বিচারে গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহত হয় ৪৫ হাজার আলজিরীয়।

১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর এক সংগে ৭০ টি স্থানে গুলীবর্ষণের মাধ্যমে আলজিরিয়াবাসী গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এ বছরই ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৬২ সালের মধ্য-মার্চ পর্যন্ত সাড়ে সাত বছরে ১০ লাখ আলজিরীয় প্রাণ হারায় এবং ৫ লাখ লোক দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। সমগ্র আলজিরিয়াতে এমন কোন মুসলিম পরিবার ছিল না, যে পরিবারের কোন না কোন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ অথবা কারারুদ্ধ কিংবা অন্য কোনভাবে নির্যাতিত হননি। ১৯৬২ সালের ১৯ শে মার্চ তারিখে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২রা জুলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা জুলাই আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্যরা সব রকমের অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করে। এতদসত্ত্বেও শেষের ৭/৮ বছরের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লাখ আলজিরিয়াবাসী প্রাণ হারায়।

**লেবানন**- লেবানন মাত্র ৪০১৫ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট পর্বতসংকুল একটি ছোট্ট দেশ। লোক সংখ্যা ১৯৮৯ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ৩৯ লাখ ২৩ হাজার। এই জনসংখ্যার মধ্যে কতটি দল ও গ্রুপ রয়েছে, তা শুমার করা কঠিন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েলের প্রতি অনুগত আধা-সামরিক বাহিনীর গ্রুপ ছিল ১০০০টি। ১৯৮৮ সালে এই গ্রুপগুলোকে বিলুপ্ত করে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৯৪৩ সালে ফরাসী সৈন্যরা লেবানন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৪৬ সালে সৈন্যরা পুরোপুরি চলে যাওয়ার পর স্বাধীন লেবাননের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর থেকে লেবানন মোটামুটি শান্ত ছিল। ১৯৫৮ সনে সিরিয়া সমর্থিত অভ্যুত্থানের অজুহাতে মার্কিন নৌ-সৈন্যেরা লেবাননে প্রথম আগ্রাসন চালায়। ১৯৭০ সালে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরাঈলী হস্তক্ষেপের ফলে প্রায় দু'লাখ ফিলিস্তিনী লেবাননে প্রবেশ করে। ১৯৭২ সালে বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে ইসরাঈল লেবানন


www.pathagar.com

সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ফিলিস্তিনী শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায়। ১৯৭৫ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এবছর এবং পরবর্তী বছরে গৃহযুদ্ধে ৬০ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হয়। বশীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়েও ফ্যালাঞ্জিস্ট বাহিনী রাতের অন্ধকারে শাবরা-শাতিলা শরণার্থী শিবিরে ইতিহাসের নজীরবিহীন হত্যাকান্ড চালায়। নিহত হয় হাজার হাজার নর-নারী ও শিশু।

লেবাননে প্রতিদিনই যুদ্ধ চলছে। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে সেখানে এক যুগের প্রাণহানির যে সংখ্যা নিরূপণ করা হয়, তা ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশী ছিল না। ১৯৮৭ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত লেবানন পুলিশের এক রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাঈলী আগ্রাসনের সময় যে প্রাণহানি ঘটে, তাদের বাদ দিয়ে এক যুগের যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৩০ হাজার। লেবাননে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর (এফ এস আই) পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে প্রকাশিত এই রিপোর্টে গত এক যুগের (১৯৭৫-১৯৮৭) অধিককাল স্থায়ী লেবাননী-সিরীয় এবং ফিলিস্তিনী বাহিনীর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধে নিহত ১২ হাজার ৪৩৬ জন লোকের জাতীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া হয়নি। তবে রিপোর্টে বলা হয়, এই যুদ্ধে ১ লাখ ৫০ হাজার ৬৮০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ১৭ হাজার ৪১৫ জন হয় নিখোঁজ, অপহৃত হয় ১৩ হাজার ৯৬৮ জন, তন্মধ্যে ১০ হাজার নিহত হয়। এখনও লেবাননে যুদ্ধ চলছে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা আরও ২০ হাজার যোগ করলেও সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দেড় লাখের বেশী হয় না। অথচ লেবাননে বিরতিহীন যুদ্ধ বিগত ১৭ বছর ধরেই চলছে। বোমাবর্ষণ থেকে বেয়নেট-কোন যুদ্ধাস্ত্রই এই যুদ্ধে এস্তেমাল থেকে বাদ যাচ্ছে না। এদতসত্ত্বেও ১৭ বছরে নিহত হয় দেড় লাখ।

**কম্বোডিয়া**- উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রায় শেষ প্রান্ত ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পাঁচবার দেশটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশটির বর্তমান নাম কম্বোডিয়া। এই কম্বোডিয়ায় ১৯৭০ সালের পর থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এখনও যুদ্ধ চলছে। লাখ লাখ লোক শরণার্থী হিসাবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিনই রক্ত ঝরছে সে দেশে।


www.pathagar.com

পলপটের হত্যাযজ্ঞকে একমাত্র নাজী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাথে তুলনা করা যায়। তিনি ১০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন। মার্কিন বিমানবাহিনী কম্বোডিয়ার উপর ৫ লাখ ৩৯ হাজার ১ শত ২৯ টন বোমাবর্ষণ করে। প্রায় দু'যুগের এই যুদ্ধে সর্বসাকুল্যে ২১ লাখ লোক নিহত হয়।

**লিবিয়া**– ১৯১২ সালে ইতালী দখল করে নেয় লিবিয়াকে। ১৯৫২ সালের ২রা জানুয়ারী লিবিয়া শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করে। শাসনপদ্ধতি থাকে রাজতান্ত্রিক। ১৯১২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত লিবিয়াবাসী নিরবচ্ছিন্নভাবে ইতালীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই ৪০ বছরের মুক্তিযুদ্ধে লিবিয়া তার অনেক সন্তানকে হারিয়েছে, কিন্তু এই সংখ্যা অর্ধ লাখ অতিক্রম করেনি।

**আফগানিস্তান**– আফগানিস্তানে দীর্ঘ ১৪ বছর আফগান মুজাহিদরা দেশকে সোভিয়েত দখলমুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যায়। মুজাহিদরা দেশকে মুক্ত করার জন্য একদিকে লড়াই করেছে সোভিয়েতের পুতুল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে (তারাকি থেকে নজিবুল্লাহ পর্যন্ত)। অপরদিকে লড়াই করেছে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। এই পুতুল সরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার মুজাহিদদের দমন ও নির্মূলের জন্য সব রকমের অস্ত্রই ব্যবহার করেছে। দীর্ঘ ১৪ বছরের এ যুদ্ধে ২০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

**ইরান–ইরাক যুদ্ধ**– এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে। আর এ যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে। এই নয় বছরের যুদ্ধ ছিল দু'দেশের মধ্যে একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। অত্যাধুনিক সব রকমের অস্ত্রই এই দু'দেশ ব্যবহার করেছিল।

দু'টি দেশই আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি লংঘন করে বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। এতে লোক ক্ষয় হয় প্রচুর। আর এ সংখ্যাটি এই নয় বছরের ভয়াবহ যুদ্ধেও ১০ লাখ অতিক্রম করেনি। সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক হারিয়েছে ১ লাখ সৈন্য।

**এঙ্গোলা**– এঙ্গোলা ১৬ বছরের গৃহযুদ্ধে হারিয়েছে ৩ লাখ এঙ্গোলাবাসী।

**শ্রীলঙ্কা**– শ্রীলঙ্কায় ১৯৮১ সাল থেকে চলছে গৃহযুদ্ধ। অথচ লোক ক্ষয় এখনও ১ লাখ অতিক্রম করেনি।



www.pathagar.com

এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যই উদঘাটিত হয় যে, আট বা নয় মাসে কোন দেশেরই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি এবং শুধু বন্দুক-স্টেনগান নিয়েও যুদ্ধ হয়নি। সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে এই আধুনিক যুগে প্রায় অস্ত্রহীন এই যুদ্ধে ৩০ লাখ লোক মারা যাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভারতে যেসব বাংলাদেশী প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে দিন যাপন করছিল, তাদের মধ্যে ১০ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশু মারা যায়। এ তথ্য জনাব আবদুল গফফার চৌধুরীর একটি লেখায় আছে, যা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এসব তথ্য বিচারে নির্দ্বিধায় এ মন্তব্য করা যায় যে, ভারতে নিহত ১০ লাখ বাংলাদেশী এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আর যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত বাংলাদেশীদের মোট সংখ্যা এ পর্যন্ত ১২ লাখও অতিক্রম করেনি। অথচ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পরই বিনা জরিপে ৩০ লাখ নিহতের কথা ঘোষণা করা হলো। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এতবড় খেয়ালী সংখ্যা বিশ্বে এটাই বোধহয়প্রথম।

'লেখকের কথা' শিরোনামে এই দীর্ঘ আলোচনা সত্য উদঘাটনের প্রয়োজনেই করতে হলো। এই পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে বন্ধুবর জনাব মতিউর রহমান, জনাব আবু নঈম, জনাব আব্দুল ওয়াহেদ খান এবং আমার বড় ছেলে কাওসার উদ্দিন মাহমুদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইখানা পাঠকরা কিভাবে এবং কতটুকু গ্রহণ করবেন তা আমি জানি না, তবে একটা বাস্তব সত্য এতদিন যে মিথ্যার আবরণে ঢাকা পড়ে ছিল, তা উন্মোচন করাই এই পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা যদি এই পুস্তক পাঠ করে সত্যকে জানতে সক্ষম হন, তাহলে আমি মনে করব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। রাব্বুল আলামীন আমার এই মেহনতকে যদি কবুল করে নেন, তাহলে সেটাই হবে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার জন্য বড় পুরস্কার। সকল পাঠক-পাঠিকাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে এই পুস্তক পাঠের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

—জহুরী

১-১-৯৩



www.pathagar.com

# তিরিশ লাখের তেলেসমাত

*"মুক্তি সংগ্রামকালে স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ বাংগালী প্রাণ দিয়েছে, ২ লাখ নারী সতীত্ব হারিয়েছে"।*

এই সংখ্যা আর কথা একসময় আওয়ামী-বাকশালীদের জপমালায় পরিণত হয়েছিল। সুযোগ পেলে এখনও তাঁরা একই কথাকে জপতে থাকেন; কিন্তু সংখ্যাটি আর ঘন ঘন উচ্চারণ করেন না। কারণ বোধহয় এই, ভিত্তিহীন এই সংখ্যা উচ্চারণ করতে তাঁরা এখন কিছুটা লজ্জাবোধ করেন। লজ্জাবোধের কারণও আছে। তাঁদের সেই আমলের বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট সংগী সাথীদের দু'চার জন এই কল্পিত সংখ্যার গোমর ফাঁস করে দেন। শুধু তাই নয়, লজ্জা ঢাকার জন্য তাঁরা হাওয়া থেকে পাওয়া এই পরিসংখ্যান সংশোধনেরও উপদেশ দেন। এমন কি, কাল্পনিক সংখ্যাটি উচ্চারণ আর না করার পরামর্শও তাঁদের অনেকে দিয়েছেন। প্রকৃত সংখ্যাটি কি হতে পারে, তা মোটামুটি হিসাব কষেও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জাতিকে জানিয়েছেন। কিন্তু এই 'তিরিশ লাখ' সংখ্যাটির জন্মের উৎসে কোথায়, তা এ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেননি বলে আমি দাবী করছি। সেই উৎসের সন্ধান আমি প্রমাণসহ এ আলোচনায় পেশ করবো। সবচেয়ে জঘন্য অপবাদটা তাঁরা চাপিয়েছেন আমাদের মা-বোনদের উপর। সতীত্বহারা মা-বোনদের সংখ্যা বিনা জরিপে ঢেড়াঁ পিটিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন। আমি একথা কখনো বলবো না যে, চরিত্রহীন দেশী-বিদেশী কোন কোন সেনার দ্বারা এদেশের কোন নারী লাঞ্ছিতা হননি; অবশ্যই হয়েছেন, তবে তাদের সংখ্যা যে ভাংতি ছাড়া একটা মস্তবড় রাউন্ড ফিগার এবং তাও দুই লাখ, তা আমি মানতে পারিনি। এছাড়াও ঘোষকদের কাছে প্রশ্ন, তারা এই হিসাব কষলেন কিসের ভিত্তিতে, কোন জরিপের হিসাবে? সেই উত্তর তারা কখনো দিতে পারেননি। কি লজ্জার কথা!

www.pathagar.com

আমাদের মা-বোনদের কেউ কেউ যদি দেশী-বিদেশী দুর্বৃত্তদের দ্বারা লাঞ্ছিতাও হন, তাহলে এই শরম ঢেকে রাখা উচিত মা-বোনদের ভবিষ্যত জীবনের দিকে চেয়ে। এই শরমের ঘটনাকে বিশ্বময় মা-বোনদের কোন স্বজন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাবলিসিটি দিতে পারেন না। আমরা হয়তো এ ক্ষেত্রে এতটুকু বলতে পারতাম যে, হানাদার বাহিনীর হাতে আমাদের মা-বোনদের অনেকেই ইজ্জত হারিয়েছেন। এতটুকু বললে অনেক কিছুই বলা হয়ে যেত; আর লজ্জা-শরমের একটি প্রোটেকশন পাওয়া যেত। অর্থাৎ, সংখ্যাটা নির্দিষ্ট হতো না এবং ইজ্জতহারা মহিলারা চিহ্নিত হয়ে পড়তেন না। কিন্তু ঘোষকদের মন্ত্রণাদাতারা এমন মন্ত্রণা দিলেন, যাতে পাবলিসিটিতে রাখি-ঢাকি কিছু না থাকে। টেলিভিশনে কিছু চেহারাও তারা প্রদর্শন করলেন, ফিল্ম তৈরী করে দুনিয়াকে দেখালেন, এমন কি পত্র-পত্রিকায় অনেকের নাম-ধামও ছাপালেন। এর অর্থ হলো এই, পাঞ্জাবীরা যা সর্বনাশ করে অবশিষ্ট রেখেছে, বাকিটা আমরাই সম্পন্ন করলাম। তাঁরা একটিবারও ভাবলেন না যে, দু'লাখ যুবতী যে দেশে ৯ মাসে সতীত্ব হারায়, সে দেশে প্রায় দু'লাখ পরিবারই তো সমাজে ইজ্জত হারায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, এ দু'লাখ নারীর মধ্যে ঘোষণাকারীদের মা-বোন আছেন কিনা, সে সম্পর্কে কিন্তু তারা কিছু বললেন না। তাদের পাবলিসিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই, যত অসতী, সবই বাইরের পরিবারের, তাঁদের পরিবারের সবাই সতী।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জমান ২২শে ডিসেম্বর (১৯৭১) মুজিবনগর থেকে এক ঘোষণায় বললেন, "যেসকল নারী এবং যুবতী গত নয় মাসে দখলদার পাক-বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পড়েছিলেন, তাদের সকলকেই বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের বীরাঙ্গনা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হবে।" -দৈনিক পূর্বদেশ, ২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, ১৯৭১। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'বীরাঙ্গনা' আর খবরের সূত্র হিসাবে বলা হয় "বেতার সূত্রে প্রাপ্ত"। এখন যদি কেউ তাদের এ প্রশ্ন করেনঃ শুনুন জনাবরা, ঠোঁট নেড়ে বাক্য উচ্চারণ করে পূর্ণ মর্যাদা তো তাদের দিলেন, বলুন তো এ পর্যন্ত


www.pathagar.com

তাদের কজনকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পুনর্বাসিত করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারবেন? না পারবেন না। সেম্পুল হিসাবে রেখেছেন কজনকে। প্রয়োজন দেখা দিলে এদের কুমীরের বাচ্চার মত প্রদর্শন করেন।

দুই লাখ নারীর সতীত্বহানি আর তিরিশ লাখ লোকের প্রাণহানির পরিসংখ্যান –এই দুটি কিভাবে কোন্ উৎস থেকে নির্গত হলো, সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কর, দুঃখজনক ও কৌতুকপ্রদ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস বর্ণনার আগে আওয়ামী বাকশালীদের চরিত্রটা কি, সে সম্পর্কে দু'কথা বলা দরকার। আমি এই দলের ভিতরে ও বাইরে থেকে যতটুকু জেনেছি, তাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন মননশীলতার কোন ছাপ দলটি রাখেনা এবং সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করাও এ দলটি জানে না। তাদের খেয়ালী কথা ও আজগুবি পরিসংখ্যানের বহু দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদ নির্বাচনের মওসু–মে প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় (সংসদ র্নিবাচন ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয়) বলেছিলেন, "জিয়াউর রহমান ও এরশাদ বিদেশ থেকে পেয়েছেন ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং তারা এই টাকা তাদের শাসনামলে বিদেশে পাচার করেছেন," কি অদ্ভুত আর গাঁজাখুরী কথা। বিদেশ থেকে তারা যা সাহায্য পেলেন, সবই যদি বিদেশে তারা পাচার করে দিলেন, তাহলে দেশের মানুষকে এতদিন কি খাওয়ালেন? দেশের উন্নয়নে কি তারা এই বিপুল অর্থের কোন কানা–কড়িও ব্যয় করেননি? এই গাঁজাখুরী কথার কেউ প্রতিবাদ করেনি, যেমন প্রতিবাদ করেনি শেখ মুজিবুর রহমানের সেই কল্পিত কথার। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কাগজ তৈরী হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে, সেখান থেকে সীল লেগে পূর্ব পাকিস্তানে আসে।" এই অসত্য কথাটি প্রতিবাদহীন থাকার কারণে অনেকে এই মিথ্যা কথাকে সত্য বলে সেদিন গ্রহণ করে নেন। ভাবাবেগে কথা বলা, সত্য–মিথ্যা বাছবিচার



www.pathagar.com

না করে কিছু বলে ফেলা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। মোসাহেবদের হাততালির আওয়াজ শুনে তাঁরা ভাবেন, গোটা জাতি বুঝি তাদের বাহবা দিচ্ছে। এই স্থূল ভাবনা তাদের প্রায়ই বেসামাল করে তোলে। অনেকে তাদের এসব প্রলাপকে সমর্থন করেন তাদের ডুবে মরতে সহযোগিতা করার জন্য। যুক্তির পথে তাদের চলাফেরা খুবই কম, শক্তি প্রয়োগই তাদের বিজয়ের একমাত্র কৌশল। এজন্য নিরীহ লোক তাদের কন্ঠ থেকে উচ্চারিত মিথ্যা কথা শুনেও ভয়ে প্রতিবাদ করে না। ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশনায় তাদের জুড়ি নেই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

তৎকালীন আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ (১৩ই অক্টোবর ১৯৭৩ সাল) সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে বলেন, "পরের উপর দোষ চাপানোটাই আমাদের নেতাদের (আওয়ামী লীগারদের) অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাবী দখলদার বাহিনীটাই আমাদের শাসকদের সবচেয়ে সুবিধাজনক হ্যান্ডি স্কেপগোট। এটা তারা সব কাজে লাগান। সালুনেও লাগান, ব্যঞ্জনেও লাগান। অনেক সময় উদ্ভট ও হাস্যকররূপেও লাগান। নিজের দোষ অপরের কাঁধে চাপান শুধু একটা বাতিকই নয়, কঠিন রোগও। এমন বাতিকের নজির আমাদের পুল ভাঙ্গার ব্যাপার। নয় মাসের যুদ্ধে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তিন শত ভাংগা পুলের সব কয়টি তাহারা ভাংগিয়াছে, ইহা ঠিক নয়। পুল ভাংগার গৌরবটা নেতারা কেন পাঞ্জাবীদের দিতেছেন? এতে এক সংগে তাহারা দুইটা অন্যায় করিতেছেন। প্রথমত, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করিতেছেন। দ্বিতীয়ত; সরকারের তথ্যগত সত্যবাদিতা সম্পর্কে নাহক জনগণকে সন্দিহান করিতেছেন।"

জনাব আবুল মনসুর আহমদের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করার সাহস আওয়ামী লীগারদের সেদিন হয়নি এবং আজও সেই সাহস নেই। কারণ, এই তথ্য খন্ডনের জন্য অন্য কোন সত্য তথ্য তাদের কাছে নেই। ৩০ লাখ বাংগালীর প্রাণ দেয়ার যে কথা তারা বলেন, সেই


www.pathagar.com

সংখ্যাটিও কাল্পনিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাল্পনিক না বলে বরং আমি বলবো, এই ৩০ লাখের কথাটা তারা পেয়েছেন ছোঁয়াচে রোগের মত। এজন্য তাদের কোন মেহনত করতে হয়নি। একজন থেকে কয়েকজন, কয়েকজন থেকে বহুজন, অতঃপর কোটি কোটি জনে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা '৩০ লাখ ৩০ লাখ' বলে চিৎকার দেন, তারা জনাব আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, "সালুনেও লাগান, ব্যঞ্জনেও লাগান"। তাদের যেকোন একজনের কাছে বা সকলের কাছে আমি যদি চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ প্রশ্ন করি যে, এই সংখ্যাটি ভুল, আপনারা কখন এবং কিসের ভিত্তিতে হিসাব কষে এই সংখ্যা নিরূপণ করেছেন, তা কি বলতে পারবেন? আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি, তাঁরা আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

তাদের উচ্চারিত এই অলীক সংখ্যা যে সংক্রামক ভুলের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ, সেই ইতিহাস আমার থেকে শুনুন। আমি যেসব তথ্য পেশ করবো, তার একটিও যদি তারা ভুল বা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে ওয়াদা করছি, আমিও এই তিরিশ লাখকে সঠিক বলে মেনে নেবো। কিন্তু যদি তারা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমার উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তি খন্ডন করতে না পারেন, তাহলে তওবা করে শপথ নিতে হবে, এমন উদ্ভট সংখ্যা আর কোনদিন মুখে উচ্চারণ করবেন না। আজ পর্যন্ত তারা কোন জরিপ করেননি, তথ্য সংগ্রহ করেননি, অথচ ৩০ লাখের কথা বলে বেড়াচ্ছেন। গোটা জাতিকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাচ্ছেন। মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোতে বহু লোক মারা গেছেন, তা কেউ অস্বীকার করছেন না এবং ভবিষ্যতেও কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু সংখ্যাটি কত, তা এখনও কেউ জানেন না, সঠিক সংখ্যা জানার মত কোন চেষ্টাও কেউ করেননি। আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছর শাসন আমলের শুরুতে সঠিক সংখ্যা নিরূপণের একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল; কিন্তু সরেজমিনে কোন তৎপরতা শুরুও হয়নি। সুতরাং, যেহেতু আমরা জানি না সঠিক বা অনুমানভিত্তিক সংখ্যাও, তখন তাদের এভাবে কথাটা বলা উচিত ছিল, "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি" অথবা "অসংখ্য বা অজ্ঞাত সংখ্যক প্রাণের



www.pathagar.com

বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি," তাহলে কেউ কোন মন্তব্য করার সুযোগ পেত না এবং মিথ্যাও বলা হতো না।

যাহোক, সেই অলীক সংখ্যার ইতিহাস শুনার আগে আওয়ামী লীগের সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুল মোহাইমেন এবং একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের–এর বক্তব্য শুনুন। সর্বশেষে আমার নিবেদন পাঠ করার অনুরোধ রইলো।

জনাব আব্দুল মোহাইমেন 'এই সংখ্যাটি' সম্পর্কে যে বক্তব্য ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে পেশ করেন, তা দেশের প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় দৈনিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাপ্তাহিক তারকালোকের জনাব ইয়াহইয়া মির্জা ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তাঁর যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, সেই সাক্ষা ৎকারটি তারকালোকের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখানে আমি তারকালোকে প্রকাশিত জনাব মোহাইমেনের সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরছি।

"গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে 'ভাষা দিবস' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের এমপি ও ভাষা সৈনিক আবদুল মোহাইমেন বলেন, "বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট–এর কাছে এক সাক্ষাৎকার দানকালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ থেকে ভুলক্রমে ফসকে যাওয়া একটি শব্দের জন্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহতের সংখ্যা তিন লাখের স্থলে ৩০ লাখ হয়ে গেছে।

"আবদুল মোহাইমেন দেশের একজন প্রগতিশীল রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার মাধ্যমে তাঁর রাজনীতির জীবন শুরু হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর থেকে প্রাদেশিক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং


www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি বেশ সুপরিচিত। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকও। ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ' নামে তাঁর প্রথম বইটি বাংলদেশের রাজনীতিক মহলে চমক সৃষ্টি করে ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ প্রশংসিত হয়। এরপর তাঁর লেখা 'একটি আত্মার মৃত্যু', 'সোভিয়েতে দুই সপ্তাহ' ও অন্যান্য রচনা, 'দুই দশকের স্মৃতি' গ্রন্থ বেশ আলোচিত হয়।

"স্বাধীনতালাভের দীর্ঘ ১৯ বছর পর স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা নিয়ে জনাব আবদুল মোহাইমেনের এই বক্তব্য বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্নের। হঠাৎ করে তাঁর এই বক্তব্য কেন? স্বাধীনতা যুদ্ধে আসলে কতজন প্রাণ দিয়েছিলেন? ৩০ লাখ না তিন লাখ? যদি তিন লাখ লোকই মারা যায়, তাহলে কেন প্রকৃত সংখ্যা চেপে যাওয়া হয়েছে?

"গত ২৩ ফেব্রুয়ারী আবদুল মোহাইমেন আমাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধকে কোনভাবে অবমূল্যায়ন করার জন্য আমি এ কথা বলিনি। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য, যা ঘটেছে তা দেশবাসী ও বর্তমান প্রজন্মের জানা উচিত। আজকে অনেকের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এতগুলো (৩০ লাখ) জীবন বিসর্জনের পরেও আমরা স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ পাচ্ছি না। এত ত্যাগ-তিতীক্ষার পরেও আজকে সমাজ জীবনে এত বড় ধস কেন নামলো এবং যুবসমাজ বা দেশ-সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় এত বিরাট আকারে কেন দেখা দিল?

"মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যেসব সচেতন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যে সিদ্ধান্তে তাঁরা এসেছেন, সেটা হলো, মুক্তিযুদ্ধে যে পরিমাণ সত্যিকারের ত্যাগ এবং রক্ত দেয়া প্রয়োজন ছিল, আমরা তা দেইনি। আলজিরিয়াতে ৮০ লক্ষ লোকের মুক্তির জন্য ৮ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল এবং সেই যুদ্ধ চলেছিল সুদীর্ঘ ১১ বছর ধরে।



www.pathagar.com

ভিয়েতনামে তিন কোটি লোকের মুক্তির জন্য ১০ লক্ষ লোক আত্মাহুতি দিয়েছিল। আমাদের দেশেও সাড়ে নয় কোটি (তৎকালীন) মুক্তির জন্য কমপক্ষে ২০/২৫ লক্ষ লোকের প্রাণ দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মাত্র নয় মাস চলেছিল, তাই সেই পরিমাণ লোকের আত্মাহুতি দেয়ার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আবদুল মোহাইমেন বলেন, "আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ঘোষণা দিয়েছি, তাতে আমরা নিহতের সংখ্যা তিন লক্ষ বলে ঘোষণা করেছিলাম এবং এই হিসাবটিও আমরা তখন কলকাতায় বসে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যা দাঁড় করিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে নিহতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করার প্রয়াস পাই। তখন বৃহত্তর নোয়াখালীর মৃতদের সংখ্যা বের করার দায়িত্ব গণপরিষদের সদস্য হিসেবে আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে সংখ্যা পেয়েছিলাম, সেটা সাত হাজারেরও কম, নিহত রাজাকারদের সংখ্যা ধরেও সাড়ে সাত হাজারের বেশি দাঁড়ায়নি। তখন বাংলাদেশে ১৯ টি জেলা ছিল। সব কয়টি জেলাতেই যুদ্ধ সমভাবে হয়নি। যেসব জেলাতে যুদ্ধের প্রকোপ বেশি হয়েছিল, তার মধ্যে নোয়াখালী একটি।

সেখানে পরশুরাম, ফেনী, ছাগলনাইয়া, বিলোনিয়া ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে বেশ কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দেশে এমন কয়েকটি জেলাও আছে, যেখানে যুদ্ধ তেমন হয়নি। তাই সেসব অঞ্চলে মৃতের সংখ্যাও অনেক কম হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যুদ্ধ সাধারণত বেশি হয়েছিল সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে। কিন্তু ঢাকা জেলা ব্যতীত আভ্যন্তরীণ অনেক জেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তাই নোয়াখালী জেলায় মৃতের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছিল, গড়ে ঐ সংখ্যা যদি সব জেলাতে ধরা যায়, তাতেও লাখ সোয়া লাখের বেশি মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় না। যাহোক, আমরা অফিসিয়ালী বরাবর প্রবাসী


www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে নিহতের সংখ্যা তিন লক্ষ বলে এসেছি এবং এই সংখ্যাটি মোটামুটি স্থিরীকৃত সংখ্যা হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম। পরে যখন ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন, তখন তিনি (শেখ মুজিব) তিন লক্ষকে ভুলক্রমে তিন মিলিয়ন বলে ফেলেন এবং এরপর থেকেই চালু হয়ে গেল দেশে ৩০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে।"

– কিন্তু তখন আপনারা বা কেউ এই ভুলটি শোধরালেন না কেন?

–কেউ শোধরাননি কিংবা প্রতিবাদ করেননি মুজিববাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর ভয়ে। শেখ মুজিব ভুলটি নিজে জেনেও সংশোধন করতে এগিয়ে আসেননি। এমন কি তখনকার সময়ে আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস–প্রেসিডেন্ট কাজী জহিরুল কাইয়ুম, 'একাত্তরের রণাঙ্গন' খ্যাত এই লেখকের আর একটি গ্রন্থ 'একাত্তরের বিজয়'–এই গ্রন্থে একটি সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিন লক্ষ লোকের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন–এর প্রতিবাদও কোন আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মী করেননি।

–আপনি–ই বা এতদিন পরে কেন এই কথা বলছেন?

–আমি আগেই বলেছি, আমি স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবমূল্যায়ন করতে চাই না। আমার বক্তব্য, সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতার বেদীতে যে পরিমাণ রক্ত ঢালা উচিত ছিল, তা আমরা ঢালিনি। সাড়ে নয় কোটি লোকের জন্য কমপক্ষে ২০/২৫ লক্ষের প্রাণ দেয়া উচিত ছিল আর যুদ্ধটির ধারাবাহিকতা হওয়া উচিত ছিল ১০/১২ বছর ধরে।

আবদুল মোহাইমেন বলেন, ৩০লক্ষ লোক নিহত হলে এক গ্রামে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হতো। কিন্তু কোন গ্রামেই এত লোক মরেনি। বর্তমান প্রজন্মকে সত্যিকারভাবে জানতে হবে কত রক্ত দেয়া উচিত ছিল, কতটুকু দেয়া হয়েছে আর কতটুকু বাকি আছে। যে পরিমাণ রক্ত দেয়া বাকি আছে, সেই পরিমাণ রক্ত দিতে হবে। তা না হলে সত্যিকারের স্বাধীনতা আসবে না। ৩০ লক্ষ লোক যে মরেনি তার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৭২ সালে সরকারের তরফ থেকে প্রতি


www.pathagar.com

নিহত জনের জন্য দু'হাজার টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে যতটুকু জানা গেছে, মাত্র ৭২ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। তার মধ্যে ৫০ হাজার নিহতের আত্মীয়দের ঘোষিত অর্থ দেয়া হয়েছে। এই ৭২ হাজারের মধ্যে আবার বহু ভুয়া দরখাস্তও ছিল। এমন কি অনেক রাজাকারও ছিল।

আবদুল মোহাইমেন আরোও বলেন, 'বর্তমান সরকারও সত্যিকার মৃতের সংখ্যা জানেন। কিন্তু বর্ধিত সংখ্যাটি স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এই জন্য, যাতে ভবিষ্যত বংশধররা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েও যখন কিছু হয়নি, তখন এ দেশে আর কিছু হবে না। বর্তমান প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সরকার এই কৌশল অবলম্বন করেছেন।

এক লক্ষ লোক মারা গেছে বলে যদি ধরা যায়, তা হলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে সিংহভাগ অবচেতনভাবে মরেছে। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ এক জিনিস, আর অব-চেতনভাবে মৃত্যু অন্য জিনিস। ২৫শে মার্চ রাতে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল, তার মধ্যে ৯৯ জন জানতো না কেন তারা মরছে। শুধু আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধের সময় অপারেশন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেসব বুদ্ধিজীবী শেষ দিকে প্রাণ দিয়েছে, তারাই স্বাধীনতার জন্য সচেতনভাবে প্রাণ দিয়েছে বলা যেতে পারে। বাকি লোক যারা মরেছে, তারা অধিকাংশ অবচেতনভাবে অবস্থার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু আলজেরিয়া বা ভিয়েতনামে যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা অধিকাংশই দেশের মুক্তির জন্য সচেতনভাবে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। এখানেই বাংলাদেশ ও আলজেরিয়া এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধের শহীদানদের গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন তথ্য বা বিশ্বাস কোন দিন শেষ পর্যন্ত দেশের সত্যিকার মঙ্গল আনতে পারে না। সেই কারণে সত্যিকার তথ্য জানতে হবে। ভবিষ্যত বংশধররা সত্য তথ্য না জানলে জাতির মঙ্গল ও উন্নতি সম্ভব নয়।


www.pathagar.com

"৩০ লাখ" সম্পর্কে জনাব আবদুল মোহাইমেনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। সুস্পষ্ট বক্তব্য, যাকে স্বব্যাখ্যাত বলা যায় অনায়াসে। কিন্তু তিনিও '৩০ লাখ' সংখ্যাটির মূল উৎসের যে সন্ধান দিলেন, তারও উদ্ভব ঘটে অনেক আগে।

এবার জনাব মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেবের পরিচয় ও বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি। জনাব মাওলানা খন্দকার যশোহরের লোক। বয়স তাঁর বর্তমানে প্রায় ৮০ বছর। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ পর্যন্ত তিনি অনেক পুস্তক লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর পুস্তকের যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। প্রখ্যাত তফসীরকার ও বক্তা হিসাবে তিনি সারাদেশে সুপরিচিত। দেশের সর্বত্র সফর করে থাকেন। যুক্তি-ভিত্তিক আলোচনা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি যদিও আওয়ামী লীগের সমর্থক কখনো ছিলেন না বা এখনও নন্, তবুও আমি তাঁর "৩০ লাখ" সম্পর্কিত বক্তব্য তাঁরই পুস্তক 'সওয়াল-জওয়াব' ৫ম খন্ড (প্রকাশকাল ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৯) থেকে এজন্য গ্রহণ করেছি যে, তাতে আমি তথ্য ও যুক্তি একই সাথে পেয়েছি। তিনি এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমি শুধু এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত মুখ্য কথাগুলো তাঁর রচনা থেকে পেশ করছি। উদ্ধৃত তথ্য হচ্ছে এই-

**"আমার জানা মতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে লোক মরেছে চার পর্যায়ে। যথা-**

১। ২৫শে মার্চের (১৯৭১) পূর্ব পর্যন্ত।

২। ২৫শে মার্চের পর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৩। ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪। অস্ত্র জমা দেয়ার পর থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

বাংলাদেশ খুব একটা বড় দেশ নয়। সরকারের বর্ষ পরিসংখ্যানের হিসাব মোতাবেক ঐ সময় গোটা পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৮৩৮৫, ইউনিয়ন ছিল মাত্র ৪,৪৭২; আর বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,৭৩০০০। ১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৬,৯৭, ৭৪,০০০; আর



www.pathagar.com

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৭,২৩,৯২০০০ হাজার। আমরা যদি ৩০ লাখকে ৬৮ হাজার গ্রাম দিয়ে ভাগ করি, তাহলে প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে প্রায় ৪৫ জন লোক মরা লাগে। কিন্তু তা কি মরেছে? ১ কোটি ২৭ লাখ বাড়ী থেকে ৩০ লাখ লোক মরলে প্রতি ৪টি বাড়ী থেকে মরা লাগে গড়ে ১ জন করে এবং ৭ কোটি লোক থেকে ৩০ লাখ মরলে প্রতি ২৩ জনে ১ জন মরা লাগে। এখন আপনারা যারা ৭১-এর ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন, তারাই বলুনঃ

১। গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে কি ৪৫ জন লোক মরেছে?

২। প্রতি চারটি বাড়ী থেকে কি গড়ে ১টি লোক মরেছে?

৩। প্রতি ২৩ জনে কি গড়ে ১ জন লোক মরেছে?

আমার স্পষ্টই মনে আছে, আমাদের যশোহরের প্রায় এমন কোন গ্রাম ছিল না, যে গ্রাম থেকে ২০/২৫ জন ভারতে যায়নি। কিন্তু এমন বহু গ্রামের নাম বলতে পারবো, যেসব গ্রামের একজন লোকও মারা যায়নি। যেমন, আমার নিজের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েক গ্রাম থেকে একটি লোকও মরেনি। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ ভাগে যখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা যান, তখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিকট হিসাব দিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১ কোটি শরণার্থী তাঁর দেশে এসেছে। অথচ সরকারী হিসাব ছিল ২০ লাখ ২ হাজার ৬শত ২৩ জন (হয়তোবা সেই সংখ্যা ৩০ লাখই ছিল)।

জনাব আবদুল মোহাইমেন এবং জনাব মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেব,- এই দু'জনের বক্তব্যে অকাট্য যুক্তি আছে। প্রথম জন খোদ দলীয় লোক। তিনি ছিলেন দলীয় এমপি এবং নিজ জেলায় নিহতদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং এসব দিক বিবেচনা করলে জনাব মোহাইমেনের পরিবেশিত তথ্য, যুক্তি ও বক্তব্য নিঃশংকচিত্তে গ্রহণ করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে তাঁর সুসম্পর্কও ছিল। দীর্ঘ দিন এক সাথে চলাফেরাও করেছেন। ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের এবং দলের সদর-অন্দরের প্রচুর খবরও তিনি


www.pathagar.com

রাখেন। বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট–এর জিজ্ঞাসার জবাবে ৯ মাসে নিহতদের সংখ্যা তিন লাখের ইংরেজী তরজমা থ্রি মিলিয়নস বলা শেখ সাহেবের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। লাখের ইংরেজী তিনি 'মিলিয়ন' বলতে পারেন, বাংলা লাখ আর ইংরেজী Lac যে একই, এটা তাঁর না জানার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। শেখ সাহেবের ইংরেজী জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল, তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে, তিনি লাখকে মিলিয়ন শব্দে তরজমা করতে পারেন অনায়াসে। বিচারকদের সম্মেলনে Mr Judges সম্বোধন দ্বারা বক্তৃতা শুরু করার সেই ঐতিহাসিক ভুলের কথা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। অতএব, জনাব মোহাইমেন যে ভুল বলেননি, নির্ভুল তথ্যই উদঘাটন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ অন্তত আমার নেই। কিন্তু '৩০ লাখ' সংখ্যা তখন থেকেই যে শুরু হয়েছে, একথা আমি মেনে নিতে পারিনি প্রামাণ্য দলিল আমার কাছে থাকার কারণে।

পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই তো শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে ডেভিড ফ্রস্ট এর সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য–প্রমাণ রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে '৩০ লাখ' সংখ্যাটি সৃষ্টিকরে প্রচার শুরু করা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, যদি আমার দেয়া তথ্যটি সঠিক হয়, তাহলে ডেভিড ফ্রস্ট–এর ইন্টারভিউ–এর 'থ্রি মিলিয়ন' আমার উদঘাটিত তথ্যের আগের নয়; বরং পরের তথ্য। এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব মোহাইমেনের সংগে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একদিনে আলোচনাও করেছি। তিনিও আমার যুক্তিটি মেনে নিয়েছেন। অপরপক্ষে আমিও মেনে নিয়েছি যে, 'তিন লাখ' কে 'থ্রি মিলিয়নস' বলা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেই সম্ভব।

জনাব মাওলানা আবুল খয়ের তাঁর পুস্তকের এক জায়গায় বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে আসার পর "রাশিয়ার পত্রিকা 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেসতিয়ার' দু'জন সাংবাদিক প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমানের


www.pathagar.com

সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, স্যার, আপনার দেশের ৩০ লাখ মানুষ এই মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছে। ব্যস, এই সংখ্যাটি শেখ সাহেব মেনে নিলেন। ঐদিনই (১০ ই জানুয়ারী ১৯৭২) রাতের বেলায় তিনি রেডিও ভাষণে বল্লেন, এদেশের ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। এভাবেই সংখ্যাটি ৩০ লাখ হয়েছে বলে আমার জানা। তবে এ সংখ্যাটা কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব নয়, আর যেহেতু এটা শেখ সাহেব বলে ফেলেছেন, তাই এটা যে বেঠিক হিসাব, তা বলার মত সাহস তখন কারো ছিল না।”

মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেবের এ কথাও কোন দলিল নয়, শুনা কথা মাত্র, তবে একথা ঠিক যে, ঐদিন বিদেশী সাংবাদিকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে দেখা করেছিলেন এবং রেডিওতে শেখ সাহেবের ভাষণ রাতে প্রচারিত হয়েছিল; আর সেই ভাষণেই ৩০ লাখের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ৩০ লাখের জন্ম সেদিন বা সে রাতে হয়নি, এরও অন্তত চার সপ্তাহ আগে থেকে '৩০ লাখ' জন্ম নিয়ে অনেকের কাঁধে ভর করে কণ্ঠের স্বরকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এই, আওয়ামী লীগ সঠিক কোন পরিসংখ্যানের ধার ধারে না, এ প্রমাণ আমি মরহুম আবুল মনসুর আহমদের পুল ভাংগার প্রসংগটি উল্লেখ করে আগেই পেশ করেছি। ডঃ মযহারুল ইসলাম ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, তাতেও সবিস্তারে উল্লেখ আছে যে, আওয়ামী লীগ কিভাবে সঠিক পরিসংখ্যান এড়িয়ে চলে। জনাব আবদুল গফফার চৌধুরীর লিখিত এক নিবন্ধেও ৩০ লাখের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য রয়েছে। এ আলোচনায় আমি তাও উল্লেখ করবো। এবার এই '৩০ লাখ'-এর জন্মের যে ইতিহাস আমি জানি, তা পাঠকদের কাছে দলিল-প্রমানসহ পেশ করছি।


www.pathagar.com

## '৩০ লাখ' সংখ্যাটির জন্মের ইতিহাস

শুনুন সেই ইতিহাস। ইংরেজী দৈনিক অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর একটি বাংলা দৈনিকের নাম ছিল 'পূর্বদেশ'। গুণ ও মানগত দিক থেকে সেই সময় এই দৈনিকটি ছিল সকল দৈনিকের শীর্ষে। আমার ধারণা, আজো দেশের কোন দৈনিক পূর্বদেশের সেই মানগত রেকর্ড ভংগ করতে পারেনি। সেই দৈনিক পূর্বদেশের জনাব এরশাদ মজুমদারের (বর্তমানেও তিনি জীবিত আছেন। সাপ্তাহিক ফসলের তিনি মালিক ও সম্পাদক) ব্যানার হেডিং প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ২১ শে ডিসেম্বর উক্ত দৈনিকেই প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি তথ্যভিত্তিক কোন আলোচনা বা সমালোচনা ছিল না; বরং তা ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যারা প্রাণ হারিয়েছিল, তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং এ হত্যাকান্ডের জন্য যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তাদের তীব্র সমালোচনা। যুদ্ধের নয় মাসে কত লোক নিহত হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য জনাব এরশাদ মজুমদার সরকারের কাছে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন মহলের এবং বিভিন্ন ব্যক্তির অনুমান-ভিত্তিক সংখ্যা প্রকাশের তীব্র সামালোচনাও করেছিলেন। আমি এখানে তাঁর সেই প্রতিবেদনের মূলকথাগুলো পেশ করছি। ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেডিং ছিল রঙিন (লাল) অক্ষরের। প্রকাশের তারিখ ছিল ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১ সাল। ব্যানার হেডিংয়ের শিরোনাম ছিল এই 'বাংলার কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে?' সেই প্রতিবেদনের মূলকথাগুলো ছিল "এই দীর্ঘ নয় মাসের সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ডে বাংলা মায়ের কত সন্তান প্রাণ হারিয়েছে, এর কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে কি? স্বাধীনতার দাবী আমরা কি দিয়ে তৈরী করবো? টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার বুকে ইয়াহইয়া-টিক্কা-নিয়াজীরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তার কোন দলিল আজ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এ দলিল আমাদের পেতেই হবে, এ দলিল আমাদের



www.pathagar.com

তৈরী করতেই হবে, অন্যথায় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরী হবে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যত বংশধর আমাদের অভিসম্পাত দেবে। সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশে কত মানুষ হত্যা করা হয়েছে? কত লাখ? ১০, ২০, ৩০,৪০ না ৫০ লাখ? কারো কাছেই এর সঠিক উত্তর নেই। উত্তর আমাদের পেতেই হবে।"

এই প্রতিবেদনে আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু তা সংখ্যা প্রসঙ্গে নয় বলে উল্লেখ করলাম না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২১ বা ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সরকারও ছিলনা। বাংলাদেশ মন্ত্রী সভার সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব কামরুজ্জামানসহ অন্যান্য নেতা ২২ শে ডিসেম্বর বুধবার ভারত থেকে ঢাকা আগমন করেন। পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই দিনটি তারা অতিবাহিত করেন। এভাবে সরকারবিহীন দেশ চলে ২৯ শে ডিসেম্বর (১৯৭১) পর্যন্ত। ২৯ শে ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্যদের মধ্যে দফতর বন্টন করে যুদ্ধোত্তর প্রথম মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। (১) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ- (প্রধানমন্ত্রী) (ক) ক্যাবিনেট ডিভিশন, (খ) প্রতিরক্ষা, (গ) এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন, (ঘ) তথ্য ও বেতার, (ঙ) পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক বিষয়। (২) জনাব মনসুর আলী- (ক) অর্থ, (খ) শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ, (গ) বাণিজ্য। (৩) খোন্দকার মোশতাক আহমদ- (ক) আইন ও পার্লামেন্টারী বিষয়, (খ) ভূমি রাজস্ব, রেকর্ড ও জরিপ। (৪) জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান- (ক) স্বরাষ্ট্র বিষয়, (খ) সাহায্য ও পুনর্বাসন। (৫) শেখ আবদুল আজিজ- (ক) যোগাযোগ। (৬) মিঃ ফণীভূষণ মজুমদার-(ক) খাদ্য, (খ) কৃষি (গ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়। (৭) জনাব মোহাম্মদ আবদুস সামাদ- (ক) পররাষ্ট্র বিষয়। (৮) আলহাজ জহুর আহমদ চৌধুরী- (ক) স্বাস্থ্য, (খ) শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা। (৯) অধ্যাপক ইউসুফ আলী- (ক) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়, (খ) পূর্ত, হাউজিং, বিজলী ও সেচ।


www.pathagar.com

এই মন্ত্রী সভা গঠন ও দফতর বন্টনের খবর ৩০শে ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ২৯শে ডিসেম্বরে রেডিওতেও প্রচারিত হয়। সুতরাং স্বভাবতই এবং সংগত কারণেই একথা বলা যায় যে, নয় মাসে বাংলাদেশে কত লোক নিহত হয় তার জরিপ বা পরিসংখ্যান নেয়ার কাজটা মন্ত্রী সভার উপরই বর্তায় এবং তারা সে কাজ ক্ষমতা হাতে নিয়েই শুরু করতে পারেন। অর্থাৎ, সেই কাজ খুব দ্রুত শুরু হলেও ২৯শে ডিসেম্বরের (১৯৭১) পর থেকেই শুরু হতে পারে এবং কয়েক মাস সঠিকভাবে খোঁজ–খবর নিয়ে একটা সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে; আর এটাই স্বাভাবিক। এ কাজটি যে তৎক্ষণাৎ হবার মত ছিল না, তা যেকোন সাধারণ বুদ্ধিমান লোকও স্বীকার করবেন। কারণ, তখন গোটা দেশে শুরু হয়েছে প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা চরিতার্থের নতুন এক রক্তাক্ত অধ্যায়। এখানে লাশ, সেখানে লাশ, নদীতে ভাসছে লাশ, হাওর–বিলে ভাসছে লাশ। অর্থাৎ, নতুনভাবে তখন শুরু হয়েছে সন্ত্রাস, অরাজকতা, খুন, জখম, গ্রেফতার। গ্রেফতার চলছে সরকারীভাবে। প্রাইভেট বাহিনীগুলোও গ্রেফতার করে ক্যাম্পে রাখছে, অর্থ আদায় করে মুক্তি দিচ্ছে, লেনদেন সুবিধামত না হলে খতম করছে। এই অবস্থা তখন চলছিল গোটা দেশে। চলছিল গাড়ী দখল বাড়ী দখ–লের সাড়ম্বর অভিযান। যোগাযোগ অবস্থা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দেশের অধিকাংশ পুল অকেজো হয়ে পড়ে। অর্ধেক ভেংগেছে মুক্তি বাহিনী আর বাদবাকি ভেংগেছে পাক বাহিনী। ঠিক এ অবস্থায় কোন কর্মী বাহিনীর পক্ষে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সফর করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এই সীমাহীন অরাজকতা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যেদিন দেশে মোটামুটি ভাবে একটা শান্ত অবস্থা ফিরে আসবে, স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তখনই পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ শুরু হতে পারে; আর তা সম্পন্ন হতে কয়েক মাস সময় লাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! রাতারাতি যেন সেই অসাধ্য কর্মটি সাধন করলেন পূর্বদেশ সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। তিনি



www.pathagar.com

এই নয় মাসে বহাল তবিয়তে চাকুরী করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখে যা 'পাপ' করলেন, তা স্খালনের জন্য রাতারাতি 'মহান মুক্তিযোদ্ধা' সেজে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে এই পূর্বদেশেই 'ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও' শিরোনামে এক গরম সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেন। সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধেই তিনি প্রথম উল্লেখ করেন, নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। তিনি কিভাবে এই সংখ্যাটি পেলেন, গোটা সম্পাদকীয় নিবন্ধের কোথাও সংখ্যা প্রাপ্তির সূত্র উল্লেখ ছিল না। তাঁর এই সম্পাদকীয়টি পাঠ করে অনেকেই তখন মন্তব্য করেছিলেন, এই সংখ্যাটি বোধহয় তিনি স্বপ্নযোগে পেয়েছেন।

আমি এখানে জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর বিখ্যাত বা কুখ্যাত সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি হুবহু পরিবেশন করছি।

## পূর্বদেশ ॥ ২২–১২–১৯৭১ ॥
## ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও

জল্লাদ ইয়াহইয়ার পতন হয়েছে। মানবেতিহাসের সবচাইতে ঘৃণ্যপশু, হালাকু, চেঙ্গিজের বংশধর, গণতন্ত্রের দুশমন শয়তান ইয়াহইয়ার পতন হয়েছে। বেঈমান, নরখাদক পশু ইয়াহইয়ার পতন হবেই। এ পতন ইতিহাসের অমোঘ বিধান। প্রতিটি ডিক্টেটরের, স্বৈরাচারী শাসকের, গণদুশমনের এই হলো ভাগ্যলিপি।

ইয়াহইয়ার পতন ঘটেছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্ত শপথ নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাত্র আট মাস একুশ দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্মভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ফলে। জল্লাদ ইয়াহইয়া খান ছিল সামরিক পশুশক্তির প্রতিভূ। যে হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ***৩০ লাখ*** নিরীহ লোক আর দু'শতাধিক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, সেই পশু বাহিনীর সামরিক সর্বাধিনায়ক ছিল এই গণহত্যাকারী জল্লাদ ইয়াহইয়া।

তার পতন আরেকবার প্রমাণ করলো, জনতার শক্তি কি ভীষণ দুর্বার। তার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল গণ–আন্দোলনের


www.pathagar.com

বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে যারা আস্ফালন করে, তারা চিরদিনই গণবানের মুখে খড়-কুটোর মত ভেসে যায়। ভেসে যেতে বাধ্য।

যারা ভেবেছিল, ভ্রান্ত মিথ্যা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে কেড়ে নিয়ে তাকে পশুর অধম ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্ভব, হার্মাদ দস্যু ইয়াহইয়ার পতন তাদের জ্ঞান–চক্ষু উন্মোচন করে দেবে, অবশ্য যদি তাদের তেমন কিছু থাকে তবেই।

যারা ভেবেছিল, একটি ঔপনিবেশিকবাদী জল্লাদ চক্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে এশিয়ায় নিজেদের শক্তির ভারসাম্য নীতি রক্ষা করতে পারবে, বিশ্বশান্তির মহামন্ত্রের দেশ মহান ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশের বুকে তস্কর ইয়াহইয়ার পতন তাদের সেই কল্পনার গড়া স্বপ্নসৌধকেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

যারা ভেবেছিল, নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, অত্যাচারিত, উৎ পীড়িত সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামকে দাপট দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারবে, নাৎসী হিটলারের দোসর, মানবতাবিরোধী, গণঐক্যের দুশমন ইয়াহইয়া খানের পতনের মধ্য দিয়ে তারাও নিঃসন্দেহে নিজেদের চরম পরাজয়কে প্রত্যক্ষ করবে।

গণদুশমন ইয়াহইয়ার শুধুমাত্র পতনে আজ আর তার দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তারা আওয়াজ তুলেছে, গণআদালতে জল্লাদ ইয়াহইয়াকে কোর্ট মার্শাল করতে হবে। তাদের দাবী, ইয়াহইয়া যেন দেশ থেকে পালাতে না পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান অবশ্যই করতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন গণতন্ত্রের আরেক দুশমন লারকানার নবাব ভুট্টো। ভুট্টো চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরও হয়েছেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ইয়াহইয়ার ছয়জন জেনারেলকে চাকুরী থেকে বিদায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েকমাস আগে বি বি সি বলেছিলেন, বড় দিনের আগে পাকিস্তানে



www.pathagar.com

একটা কুঁদেতা হওয়ার সম্ভাবনাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। ইয়াহইয়ার পতন, তার স্থলে ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন ভূট্টোর আবির্ভাব, তা ছয়জন জেনারেলের কুঁদেতা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই কারণে গত সোমবার রাতে ক্ষমতা লাভের পর ভূট্টোর অসংলগ্ন প্রলাপোক্তির মধ্যে জাতির পিতা শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সম্পর্কেও ভূট্টোর মুখ দিয়ে কোনদিন কিছু উচ্চারিত হয়নি।

বর্তমান সামরিক জান্তার হাতের ক্রীড়নক জুলফিকার আলী ভূট্টো নিজেকে যাই ভেবে থাকুক না কেন, দেয়ালের লিখন এখন থেকেই তাকে পাঠ করতে হবে। বিগত পঁচিশে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশে যা কিছু ঘটেছে, তা বেমালুম চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা, আজগুবি আর বানোয়াট সব কান্ড-কাহিনী ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার সব কয়টি প্রচারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে রাখা হয়েছিল যে, তারা কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে, এই জল্লাদ পশু-চক্র বাংলাদেশের গণতন্ত্রী কণ্ঠকে শ্বাসরুদ্ধ করে চিরতরে হত্যার জন্যে কি মর্মান্তিক পাশবিক অত্যাচার করেছে। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের মুখপত্রগুলোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেভাবে বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছে, যেভাবে গণতন্ত্রকামী ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী জনতাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করা হয়েছিল, তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের মনে এদেশের মানুষের প্রতি তাদের সব রোষ ফেটে পড়েছিল। কিন্তু তারপর---?

পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ যখন সত্য সত্যই ভাবতে পারলেন যে, বাংলাদেশ আর তাদের শাসকশ্রেণী সামরিক জান্তার অধিকারে নেই, যখন তারা শুনলেন, স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন দেশের জন্ম হয়েছে, যখন তারা বুঝতে পারলেন, এই আজাদী অর্জনের জন্য বাংলাদেশের *৩০ লাখ* নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে, যখন তারা জানলো,


www.pathagar.com

শয়তান ইয়াহইয়ার জল্লাদ বাহিনী বাংলার বুক থেকে বাংলা মায়ের সোনার সন্তানদের–অধ্যাপক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে, একজন দুই জন নয়, হত্যা করেছে শত শত, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত জনসাধারণ বাংলাদেশের কথায় নয়, সামরিক জান্তার অলীক সব কল্পকাহিনীর বিভ্রান্তির ঘোর কাটিয়ে সম্পূর্ণ সত্যকে যথার্থ উপলদ্ধির মাধ্যমে আজ এই একটি কথাই বুঝতে পারছে যে, যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার দুরাশায় গণদাবীকে পদদলিত করার পৈশাচিক উম্মাদনায় বাংলাদেশে ইতিহাসের নজিরবিহীন হত্যালীলা চালিয়েছে, যদি তাদের সমুচিত শাস্তি না হয়, তাহলে তারা যেকোন মুহূর্তে একই পশুশক্তি নিয়ে তাদের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তারা আরও জানে, গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কারা, তাই তারা দাবী উথাপন করেছে, ইয়াহইয়াসহ তার কুকর্মের প্রত্যেকটি সহচরের ফাঁসি চাই। তাদের এই দাবী যেমন ন্যায়সঙ্গত, তেমনি মানবিক।

আমরা বিশ্বাস করি, বাংলার মানুষ যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে তাঁদের মাতৃভূমির আজাদী ছিনিয়ে এনেছে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও এইসব গণদুশমনের কৃত পাপের সমুচিত শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের রুদ্ররোষে, মানবতার দুশমনদের জনতার আদালতে একদিন চরম শাস্তি পেতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তাকে এই সত্য উপলদ্ধি করার সময় এখনি। বিলম্বে তারাও জল্লাদ ইয়াহইয়ার ও তার দোসরদের ভাগ্যবরণ করে নিতে বাধ্য, জনতার দাবী, জনতার রায় সময় থাকতে মাথা পেতে নেবার মত শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এই আশা করি।"

পূর্বদেশের সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর এ যদি দৈবজ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আমরা (সাধারণ মানুষ)


www.pathagar.com

দেখলাম, গোটা ব্যাপারটা যেন একটা ভোজবাজির খেলামাত্র। সেই খেলাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদার ঢাকাস্থ সংবাদদাতার সংগে ছিল জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর বিশেষ সম্পর্ক। অনেকের ধারণা, '৩০ লাখ' এই সংখ্যাটি প্রভদার ঢাকাস্ত প্রতিনিধির দ্বারা জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর মগজে প্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। আমি এই ধারণা যেমন গ্রহণ করি না, তেমনি উড়িয়েও দেই না। হয়তো হতেও পারে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রাভদায় প্রকাশিত একটি সংবাদ পাঠ করে মনে করলাম যে, ধারণাটি হয়তো সত্য। তিনি জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে দিয়ে '৩০ লাখ' সংখ্যাটি ছাপিয়ে এই তথ্যটি নিজ কাগজ প্রাভদায় ব্যবহার করেন। পূর্বদেশের সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখিত নিহতদের এই সংখ্যাটি তিনি দ্রুত প্রাভদায় প্রেরণ করেন। প্রাভদা তা ফলাও করে ছাপে। প্রাভদায় ছাপা সেই সংবাদটির সার-সংক্ষেপ ঢাকার কাগজে ৫ই জানুয়ারী বুধবার (১৯৭২) প্রকাশিত হয়। দৈনিক অবজারভার থেকে সেই উদ্ধৃতি পেশ করছি। সংবাদটির শিরোনাম ছিলঃ Pak Army Killed over 30 lakh people. এই শিরোনামের সংবাদটি ছিল এই- The Communist party Newspspaper 'pravda' has reported that over 30 lakh persons Were Killed throrghout Bangladesh by the pakistani occupation forces during the last nine months, reports ENA.

Quoting its special Correspondent stationed in Dacca, the paper said that the pakistan millitary forces immediately before their surrender to Mukti Bahinis and the Allied Forces had killed about 800 intellectuals in the capital city of Bangladesh alone.


www.pathagar.com

একটু লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, '৩০ লাখ' সংখ্যাটি নিছক কাল্পনিক এবং পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট একটি সংখ্যা। কিভাবে সংখ্যাটি সৃষ্টি করা যায়, প্রকাশ করা যায়, প্রসার ঘটানো যায় এবং সুকৌশলে সত্যায়িত করে প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়, এহতেশাম হায়দার চৌধুরীরা আর সোভিয়েত উপদেষ্টারা ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সে পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করেন। কেমন যেন ছকে আঁকা পরিকল্পনা। পূর্বদেশের সম্পাদকীয় নিবন্ধে ৩০ লাখের সংখ্যাটি প্রকাশ করা, ঢাকা থেকে সেই সংখ্যাটি প্রাভদার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রাভদায় প্রেরণ এবং প্রাভদা থেকে প্রকাশিত সেই সংখ্যাটি আমাদের 'এনা' দ্বারা বহন করে এনে ঢাকার দৈনিকগুলোতে পরিবেশন করা, –কেমন যেন পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ ব্যাপার।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো এবং বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব সংস্থায় এবং কাগজে পূর্বদেশের সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর আবিষ্কারকে রাশিয়ার প্রাভদার দ্বারা সত্যায়িত করে প্রেরণ করেন। এমনিভাবে বিশ্বময় সংবাদটি দ্রুত প্রচার হয়ে পড়ে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই তারা এই সংখ্যাটিকে একটা স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের সে প্রচেষ্টা সফলও হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারী (১৯৭২) বাংলাদেশে এসে এই সংখ্যাটিই ঘোষণা করেন। বিমান থেকে অবতরণের সাথে সাথে ঐ দেশী–বিদেশী গ্রুপটি তাঁর কাছে সংখ্যাটি পরিবেশন করেন। তিনিও কোন চিন্তা–ভাবনা না করে ঘোষণা করে দিলেন, "নয় মাসে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে।'' অথচ পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে, তিনি অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই নয় মাসে নিহতদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য দলীয় এম সি–দের নির্দেশ দিয়েছেন; আর সরকারীভাবে কমিটিও গঠন করেছেন।

বিচার শুরু করার আগে যে বিচারক রায় ঘোষণা করেন, তিনি


www.pathagar.com

বিচারক পদাধিকারী হলেও বলতে হবে অপ্রকৃতিস্থ বিচারক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এমন বিচারক যদি এ সভ্য ভুবনে আদৌ থেকে থাকেন। ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিয়ে কোন কোচওয়ান যদি ঘোড়ার গাড়ী চালাবার ইচ্ছা পোষণ করেন বা চেষ্টা করেন, তাহলে সেই কোচওয়ানকেও পাগল না বলে কি পারবেন? হিসাব-নিকাশ বা জরিপ আর পরিসংখ্যান ছাড়াই যারা একটা সংখ্যা ঘোষণা করে, আর পরে হিসাব কষতে নামে, হিসাবও কষে না, অথচ হিসাব ছাড়া সর্বক্ষণ কাল্পনিক সংখ্যাটি আওড়ায়, তারাও পাগল, তবে মতলববাজ পাগল। পূর্বদেশ সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর ২২শে ডিসেম্বরের সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে ৩০ লাখের ঘোষণা, প্রাভদার ঢাকাস্থ প্রতিনিধির প্রেরিত এই সংখ্যা প্রাভদায় প্রকাশ, আবার প্রাভদায় প্রকাশিত সংবাদ ৫ই জানুয়ারীর ঢাকার দৈনিকগুলোতে প্রকাশ এবং সর্বশেষে শেখ মুজিবুর রহমানের ১০ জানুয়ারীতে ৩০ লাখ নিহত হওয়ার ঘোষণা- এসব কারবারের পাশাপাশি কতকগুলো বিপরীত চিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। এই বিপরীত চিত্রগুলো হচ্ছে এইঃ-

৭ই জানুয়ারী (১৯৭২) কলিকাতা থেকে পিটিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ বলেন, বাংলাদেশে নয় মাসে পাকিস্তানী সেনারা কত লোক হত্যা করেছে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার পরিসংখ্যান গ্রহণের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। মন্ত্রী বলেন, আমার ধারণা, এই নয় মাসে ১০ লাখের বেশী লোককে নিধন করা হয়েছে। তিনি তাঁর নিজ গ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পাক সেনারা ১০৭ জনকে হত্যা করেছে।

শেখ আবদুল আজিজ যোগাযোগ মন্ত্রী হয়েও ৭ই জানুয়ারী (১৯৭২) বললেন, নিহতদের সংখ্যা ১০ লাখের বেশী এবং সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অথচ মন্ত্রীর অনুমানের ১০ লা-খের ঘোষণার ১৬ দিন আগে আরাম কেদারায় বসে এহতেশাম হায়দার


www.pathagar.com

চৌধুরী 'সঠিক হিসাব দিলেন' ৩০ লাখের, আর রাশিয়ায় বসে প্রাভদাগোষ্ঠী একই হিসাব দিলেন মন্ত্রীর ঘোষণার আরও সপ্তাহ দিন আগে। রহস্য কোথায়, অনুমান করুন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত বড় ধাপ্পার নজির বিশ্ব ইতিহাসে বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই জানুয়ারী (১৯৭২) শনিবার দলীয় কর্মী ও এম সি দের যে নির্দেশ দেন, তা ছিল এইঃ Sheikh Mujibur Rahman on saturday asked the Awami league workers and M. C. A's (Members of the Constituent Assembly) to collect detailed reports of genocide, arson and looting Committed by the pakistani Army in Bangladesh and to submit these data to the Awami league office within 15 days.

(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭২, বংলাদেশ অবজারভার)

আগেই বলেছিলাম, রায় ঘোষণার পর বিচারকার্য শুরুর কথা। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ১০/১/৭২ তারিখে ঘোষণা করলেন, নয় মাসে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। সেই ব্যক্তি একই মুখে কি করে আবার হত্যা ও লুট-পাটের জরিপের হুকুম দিতে পারলেন? এটাই বিচারের আগে রায় ঘোষণা নয় কি? মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, সেই রিপোর্ট কখনো পেশ করা হয়নি। দু'চার জন অতি কষ্ট করে হত্যা ও লুটতরাজের যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তা এতই কম ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান এই পরিসংখ্যানের উপর কোন গুরুত্বই দেননি।

১৫ ই জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নির্দেশ জারির ১৪ দিন পর ২৯শে জানুয়ারী শনিবার (১৯৭২) সরকার ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ফলে জান-মালের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণই ছিল এই কমিটির একমাত্র দায়িত্ব। পুলিশের তৎকালীন ডিআইজি জনাব এ, রহিমকে চেয়ারম্যান করে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। ৩০শে এপ্রিলের (১৯৭২) মধ্যে



www.pathagar.com

কমিটিকে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। সরকারী প্রেসনোটে উক্ত কমিটি নিয়োগের ঘোষণায় বলা হয় যে, কমিটি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীগণ কর্তৃক প্রাণহানি এবং বিষয়-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য ও তারিখ নিরূপণ করবেন। সম্ভব হলে কমিটি বিষয়-সম্পত্তির ধ্বংসসাধন ও হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী অপরাধীদেরও সনাক্ত করবেন। এ ব্যাপারে সব রকম তথ্যাদি সরবরাহ করে জনসাধারণ কমিটির সাথে পূর্ণ সহযোগিতা দান করবেন বলে সরকার আশা ব্যক্ত করেন।

কমিটির সদস্য ছিলেন অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এমসিএ, কুমিল্লা, জনাব মাহমুদুল হোসেন খান, এমসিএ, বগুড়া, জনাব আবদুল হাফিজ, এমসিএ, যশোহর, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ (ন্যাপ), জনাব জালাল উদ্দীন মিয়া, সাবেক এসপি, জনাব মোহাম্মদ আলী, ডেপুটি সেক্রেটারী, কৃষি, জনাব টি, হোসেন, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, জনাব মহিউদ্দিন, ডিপিআই, ডাঃ মোবারক হোসেন, স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর, উইং কমান্ডার কে এম ইসলাম ও জনাব এম এ হাই, এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশনের ডেপুটি সেক্রেটারী।

এই তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন কিনা তা দেশাবাসী আজও জানতে পারেননি। আমার বিশ্বাস, তদন্ত কমিটি নির্দিষ্ট তারিখে অথবা সেই তারিখের পরে রিপোর্ট পেশ করে থাকবেন; কিন্তু রিপোর্টে যে সংখ্যা তারা উল্লেখ করেছেন, তা পূর্ব-ঘোষিত সংখ্যার (৩০লাখ) ধারে-কাছেও ছিল না, তাই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি। শোনা যায়, শেখ সাহেব সেই রিপোর্টে সংখ্যাটি ৫৬,৭৪৩ দেখে নাকি এতই গোস্‌সা হন যে, রিপোর্টটি অফিসের মেঝে ছুঁড়ে মারেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, আমি ঘোষণা করেছি ৩০ লাখ, আর তোমাদের রিপোর্টে তিন কুড়ি হাজারও হলো না? কি রিপোর্ট পেশ করলে তোমরা? থাক তোমাদের রিপোর্ট তোমাদেরই কাছে। যা একবার বলে ফেলেছি, তাই চলবে।


www.pathagar.com

এই শুনা কথা কতটুকু সত্য, তা জানি না, তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী আর প্রাভদার প্রতিনিধির কাল্পনিক সংখ্যাটি বিনা সংশোধনীতে চলছে এবং বোধহয় বরাবর চলতেই থাকবে।

ঐ ৩০ লাখ এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে জনাব আবদুল গফফার চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত দৈনিক জনপদে (২০শে মে, রোববার, ১৯৭৩) "আজ সাহস করে কিছু সত্য বলা প্রয়োজন" শিরোনামে নিজ নামে যে নিবন্ধ লিখেন, তাতেও ৩০ লাখের এই সংখ্যাটি যে ভৌতিক সংখ্যা, তা তার লেখায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসেছে। আবদুল গফফার চৌধুরীকে কেউ 'রাজাকার' বলতে পারবেন না। সুতরাং তাঁর কথা 'অগ্রহণযোগ্যও' বলা যাবে না। তিনি ২৫ শে মার্চ ১৯৭১-এর পর ভারতে চলে যান। পুরা 'ইদ্দত' তিনি ভারতে পালন করেন। এই সুবাদে তিনি মুক্তিযোদ্ধাও বটেন। প্রচুর অবসর সময় ছিল তাঁর হাতে। মেহমান হিসাবে অনেক কিছু ছিল 'ফ্রি'। তাই আগরতলা থেকে আমতলা, তালতলা সবই সফর করেছেন, প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। দেশে এসেও তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশ্বস্ত জন ছিলেন তাঁর নিহত হওয়ার দিন পর্যন্ত। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট ক'জনের মধ্যে একজন। আওয়ামী লীগের এত বড় স্তাবক, দলীয় আদর্শ প্রচারে এত বড় নিবেদিতপ্রাণ, আওয়ামী লীগে এমন জন খুব কমই আছেন। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবার নিহত হওয়ার পর জনাব আবদুল গফফার চৌধুরী মনের দুঃখে বিলাতে যে পাড়ি জমালেন, আজো তিনি দেশে ফিরে আসেননি। 'শেখবিহীন' দেশে তিনি থাকবেন্ না, এই ছিল তাঁর শপথ। সে শপথ তিনি এখনও রক্ষা করে চলছেন। আবদুল কাদের সিদ্দিকীও একই শপথ নিয়ে ভারতে গেলেন, শান্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, অবশেষে বাংলাদেশে ফিরেও আসলেন। কিন্তু জনাব আবদুল গফফার চৌধুরী ফিরে আসেননি। বিলাত থেকে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাপন্থী বা এই চিন্তার কাছাকাছি কাগজে মনের জ্বালা মিটিয়ে যা খুশী তাই লিখে



www.pathagar.com

যাচ্ছেন। মেজর (অবঃ) আবদুল জলিল মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও ভারতের লুটপাটের বিরোধিতা করায় এবং ইস-লামের দিকে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন করায় 'রাজাকার' আখ্যা পেয়েছিলেন। তাঁকে এই আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন তিনি, যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলকাতার হোটেলে হোটেলে ফুর্তি করে দিন যাপন করেছেন, তিনি হলেন বাকশালের আবদুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগে নতুন দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। জনাব আবদুল গফ্ফার চৌধুরী ইসলামেও আত্মসমর্পণ করেননি, ভারতের লুটপাটের বিরোধিতাও করেননি, আওয়ামী লীগের উপর থেকে তাঁর ঈমানও মোটেই কমেনি, তিনি '৩০ লাখ' মুক্তিযুদ্ধ এবং ফূর্তিবাজ ভোগবাদী মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে কি বলেন, তাঁর থেকেই সেই সত্য কথা শুনুন, যা তিনি 'সাহস করে' বলেছেন।

"স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগরে একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মুজিবনগরে আমরা যারা গিয়েছিলাম, তারা সকলেই বিপ্লবী চরিত্রের ছিলাম না। কেউ গিয়েছিলাম সত্য সত্যই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায়। কেউ গিয়েছিলাম প্রাণভয়ে পালিয়ে। কেউ গিয়েছিলাম পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসাবে। কেউ গিয়েছিলাম ব্যাংক লু-টের টাকা নিয়ে আয়েশী জীবন যাপন করতে। মুজিবনগরে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার কোন বিপ্লবী প্রশাসন ছিল না। যা ছিল, তাহলো একটা গতানুগতিক আমলা প্রশাসন কাঠামো। যেসব আমলা প্রাণভয়ে বা আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুজিবনগরে পালিয়ে গিয়ে এই প্রশাসন কাঠামোতে স্থান পেয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই আগের মতই নিজেদের প্রমোশন ও ঠাট-বাট নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের অনেকেই আবার প্রচুর ব্যাংক লুটের টাকা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে কিছু অর্থ বিপ্লবী সরকারে জমা দিয়ে নিজেদের সততার প্রমাণ দিয়েছেন এবং বাকী টাকা ভারতীয় ব্যাংকে বা কোন ভারতীয় বন্ধুর কাছে রেখে কলকাতা মহনগরীর নৈশ জীবনে আনন্দ ফূর্তি করেছেন। এই একই কথা অনেক রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কেও


www.pathagar.com

সত্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাংক লুটের টাকা নিয়ে কি অবিশ্বাস্য দুর্নীতি ও পাপ ব্যবসা জমে উঠেছিল, আজ তার সত্য ইতিহাস কেউ লিখলে হয়তো প্রাণে বেঁচে থাকবে না। সুতরাং সেসব কথা থাক (এই ভয়ে গফ্‌ফার চৌধুরীও সত্য কথা সবিস্তারে বলেন্‌নি)। মাত্র একদিনের কথা বলি। আমি ১৯৭১ সালের ২রা জুন দেশ ত্যাগ করি। পরদিন আগরতলায় গিয়ে উপস্থিত হই। সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। পকেটে দেড় হাজার পাকিস্তানী টাকা। আগরতলায় তখন পাকিস্তানী একশত টাকায় ভারতের বিরানব্বই টাকা পাওয়া যায়। একজন শরণার্থী বললেন, কলকাতায় গেলে ১০০ টাকায় ১০০ টাকাই পাওয়া যাবে। পরদিন ঘুম থেকে ওঠে শুনি, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট পাকিস্তান সরকার বাতিল ঘোষণা করেছেন। আগরতলায় তখন বিদেশী টাকার দুটি বাজার ছিল, একটি বটতলায় এবং অন্যটি কামান চৌমুহনীতে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে সেই চোরা বাজারে গিয়ে ধর্ণা দিলাম। বিনিময়ে পেলাম চৌদ্দ শত টাকার বদলে ৭ শত টাকা। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে যে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার বিনিময় দেখলাম, দেখলাম যেসব আমলা ও নেতার চেহারা, তারা সকলেই আজ দেশপ্রেমিক, সকলেই মুক্তিযোদ্ধা, সকলেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য মোটা পুরস্কার অর্থাৎ, গাড়ী, বাড়ী, উচ্চ পদ পেয়েছেন।

এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা পড়েনি। জমা পড়েছে এর সামান্য ভগ্নাংশ। এই কালো টাকায় মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এক অভিশপ্ত পাপ-পঙ্কিল কালো ব্যবসায়ের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের পর এই কালো ব্যবসায়ের ছায়াই আজ আমাদের জীবনে সবচাইতে বড় হয়ে উঠেছে।

*আমরা এখন বলছি, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙ্গালী শহীদ হয়েছে। কোন পরিসংখ্যান ছাড়াই আমরা বলছি ৩০ লাখ বাঙ্গালী মরেছে। কিন্তু যে এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে চার লাখ শিশু, দশ লাখ নারী এবং দু'লাখের মত বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী আমরা, যারা মুজিবনগরে গিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এই*



www.pathagar.com

*মৃত্যুর রেকর্ড আছে কলকাতার কাগজে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী সংক্রান্ত হিসাবের খাতায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে কল্যাণী, টাকি, মধ্যম গ্রাম, হাবড়া প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে বেড়িয়েছি; আর দেখেছি মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ। এক এক শিবিরে এক একদিনে ৪০০ থেকে ৫০০ শত শিশুর মৃত্যু হয়েছে অপুষ্টি আর অনাহারে। আর এই শিশু ও নারীর মুখের গ্রাস– যা সাহায্য হিসাবে বিদেশ থেকে এসেছে, তা নিয়ে কালো বাজারের ব্যবসা জমিয়েছিলেন আমাদেরই এক শ্রেণীর জনপ্রতিনিধি। যুব শিবিরে যখন আমাদের মুক্তি সেনারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তখন একদিনেই আগরতলায় ৪০ হাজার টাকার বিদেশী ঔষধ (সাহায্য) চোরাবাজারে বিক্রি করতে গিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন আমাদেরই সম্মানিত এক ব্যক্তি। শুধু ঔষধ নয়, বিদেশ থেকে যে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার সাহায্য এসেছে, তার অধিকাংশ গেছে দুর্নীতির অতল গহবরে। শিশু খাদ্য, ঔষধ, মুক্তিযোদ্ধাদের থালা-বাসন, ইউনিফর্ম, মশারী, বুট জুতা, সতরঞ্জি, কম্বল নিয়েও হয়েছে কালোবাজারী।*

যখন আর সহ্য হয়নি, তখন বড় দুঃখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা আর মুজিবনগরের একটি সাপ্তাহিক কাগজে লিখেছিলাম এই বিবরণ। জবাবে রোষ কষায়িত নব নব হুমকি শুনেছি, দেশে কি ফিরতে চাও না? দেশ ডিসেম্বরে মুক্ত হবে। এই বিবরণ ছাপার অপরাধে 'জয়বাংলা' অফিসে কাজ করতে বসে ঘেরাও হয়েছি, থিয়েটার রোডে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটুনি দেয়ারও হুমকি সহ্য করেছি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে এমন ব্যক্তিত্ব আছেন, যিনি তখন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক। তাদেরই অন্যতম এক মেজরকে বলেছিলাম, বর্তমান সরকার বিপ্লবী সরকার। এই বিপ্লবী সরকারের বিপ্লবী প্রশাসন কই? আমরা দেশ থেকে যারা পালিয়ে এসেছি, তাদের স্ক্রিনিং হওয়া দরকার। ব্যাংক লুট করে এসে সরকারকে টাকা না দিয়ে কলকাতা, ধুবড়ি বা দিল্লী–দার্জিলিংয়ে বসে যারা ফূর্তি করছি, তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। ।



www.pathagar.com

আজ আমার প্রশ্ন, ইয়াহিয়ার অস্ত্রাঘাতে নিহত '৩০ লাখ' বাঙ্গালীকে আমরা বলছি শহীদ। কিন্তু বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন ১ কোটি মানুষ, তাদের মধ্যে যে ১০ লাখ নারী-শিশু আত্মাহুতি দিয়েছে আমাদের দুর্নীতি ও লোভের রাহুগ্রাসে, তাদের কি আমরা শহীদ বলবো না? আর তাদের অকাল মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের আমরা কি আখ্যায় আখ্যায়িত করবো? (আজ সাহস করে কিছু সত্য বলা প্রযোজন/ আবদুল গফফার চৌধুরী /দৈনিক জনপদ , রোববার, ২০শে মে ১৯৭৩)

ভিত্তিহীন ৩০ লাখের এই সংখ্যা পাক-সেনাদের বিশ্বস্ত দালাল এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর উদ্ভট মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার, যিনি ৯ মাস মনের আনন্দে দৈনিক পূর্বদেশে চাকুরী করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বদেশের বিভিন্ন প্রকাশনায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে মদদ যুগিয়েছেন। অথচ এই চৌধুরী সাহেব হয়ে গেলেন ১৬ই ডিসেম্বর অন্য এক মানুষ। অতীত পাপ স্খালনের জন্য নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। শুধু তাই নয়, চোরের মার বড় গলাকে আরও বড় করার জন্য এহতেশাম হায়দার চৌধুরী নিজে উদ্যোগী হয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র উদঘাটনের উদ্দেশে কমিটি পর্যন্ত গঠন করেন। বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক এবং তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য উদঘাটন করার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২৯শে ডিসেম্বর (বুধবার) ১৯৭১ ঢাকা প্রেসক্লাবে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্বও করেন স্বয়ং জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য! গঠিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জনাব জহির রায়হান, জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব হাসান ইমাম ও ডঃ সিরাজুল ইস-লাম। জনাব জহির রায়হান কমিটির আহবায়ক নিবার্চিত হন। সভায় বক্তৃতা করেন জনাব জহির রায়হান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডঃ



www.pathagar.com

সিরাজুল ইসলাম, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব আলী আশরাফ, হাসান ইমাম, সরদার জয়েন উদ্দিন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আতাউস সামাদ ও জনাব খোন্দকার আবদুল কাদের। সভায় আলোচ্য কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিকালে প্রেসক্লাবে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটির নাম রাখা হয় 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'।

এই বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির আহবায়ককে হত্যা করা হয়। সেই হত্যা রহস্যের উদঘাটন আজও হয়নি।

এই তিরিশ লাখ সংখ্যাটির প্রায় ৯৮ ভাগ যেমন ভুয়া ছিল, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুয়া। ওপারে যারা পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের মুক্তিযোদ্ধা হওয়াটা ছিল যেন অত্যাবশ্যকীয়। যারা গ্রান্ড হোটেলের বিলাসী জীবন যাপন করেছেন পূর্ণ ৯ মাস, তারাও মুক্তিযোদ্ধা বনে যান। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে বাস করে দিন যাপন করেছেন, আত্মীয় বাড়ীতে আত্মীয় হয়ে সময় অতিবাহিত করেছেন, ব্যাংক লুটের টাকা দিয়ে গোটা ভারত ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন দৃশ্য দেখে নয়নকে পরিতৃপ্ত করেছেন, কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ু আর আসাম থেকে দিল্লী ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারাও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন এবং এখনও তারা মুক্তিযোদ্ধা। রাইফেলের আগা কোন দিকে আর মাথা কোন দিকে, তা যারা আজও জানেন না, কিভাবে রাইফেলে গুলী ভর্তি করা হয়, গুলী কিভাবে ছুঁড়তে হয়, এই জ্ঞান এখনও যাদের নেই, তারাও মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হয়ে যান। ১৬ই ডিসেম্বর এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের স্বাধীন পরিবেশে অরাজকতার নৈরাজ্যে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রাতারাতি জন্ম নেন। লাল বাহিনী, নীল বাহিনী, কালা বাহিনী, হলুদ বাহিনী, কাদের বাহিনী, ষোড়শ বাহিনীসহ বহু বাহিনী সৃষ্টি হয়। ষোড়শ বাহিনী বা সিক্সটিনথ ডিভিশনের দৌরাত্ম্য ছিল হালাকু, চেঙ্গিজ ও তৈমুর লং-এর দৌরাত্ম্যের চেয়ে অধিকতর ভয়ংকর। কারণ আসল সোনার চেয়ে নকল সোনার চাকচিক্য বেশী


www.pathagar.com

থাকে। এহতেশাম হায়দার চৌধুরীরা সেই ষোড়শ বাহিনীভুক্ত বুদ্ধিজীবী মুক্তিযোদ্ধা। ৩০ লাখ সংখ্যাটি তার মত মানুষের মগজে জন্ম নেয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঘরে যারা আগুন লাগিয়েছে, সেই অগ্নিসংযোগ কারীদের অন্যতম ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এবং তার কৃত কুকীর্তি ছিল একটু বেশী, ছিলেনও তিনি সম্মুখ সারিতে, তাই 'আগুন আগুন' বলে চিৎকারও তিনি সঙ্গত কারণেই বেশী করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এজন্য ৩০ লাখ নিহত হওয়ার চিৎকার তিনিই সর্বপ্রথম দিয়েছেন।

আগেই বলেছি, ৩০ লাখ নিহত হওয়া আর ২ লাখ মা-বোনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার পরিসংখ্যান যেমন ভুয়া, তেমনি মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও ভুয়া। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা পর্যন্ত নিরূপিত হয়নি। কে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আর কে অপ্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, তা চিহ্নিতকরণের কোন নীতিমালা বা রূপরেখা পর্যন্ত তৈরী করা হয়নি। ফলে খাঁটি-মেকী নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধায় দেশটা ভরে গেছে। কোন কোন সেক্টর কমান্ডার কাউকেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া থেকে বঞ্চিত করেন্নি। মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য যে-ই আবেদন করেছেন, তার আবেদনপত্রই মঞ্জুর হয়েছে, কেউ খালি হাতে ফেরত যান্নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সীলমোহর ও অফিসারের স্বাক্ষর জাল করা ভুয়া সার্টিফিকেটও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় যোগ হয়েছে। এমন সার্টিফিকেটের একখানা সাপ্তাহিক রোববার ১৩/১/ ৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে আমি সাপ্তাহিক বিচিত্রা (২/১/১৯৮১) থেকে পরিবেশন করছি। কর্ণেল (অবঃ) কিউ, এন জামান-এর একটি সাক্ষাৎকার এই তারিখে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। জনাব কাজী জাওয়াদ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। কর্ণেল (অবঃ) কিউ, এন, জামান-এর পরিচিতি এখানে তুলে ধরা উচিত বলে মনে করি এজন্য যে, তিনি বরাবরই একজন মুক্তিযোদ্ধা। আলবদর বা রাজাকার-এর গন্ধ তার দেহে, পরিচ্ছদে বা কথাবার্তায় নেই। এজন্যই বিচিত্রায়


www.pathagar.com

তাঁর সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল। তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে বিচিত্রা যে কথাগুলো পরিবেশন করেছিল, তা আমি নিম্নে তুলে ধরছি।

কর্ণেল কিউ, এন, জামান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাংবিধানিক কমিটির চেয়ারম্যান। জন্ম যশোরে ১৯২৫ সালের ২৪শে মার্চ। কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বি এস সি পাঠরত থাকাকালে ১৯৪৩ সালে কমিশন নিয়ে নৌবাহিনীতে যোগ দেন। তখন সারা ভারতে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' ও ভীষণ জোরদার। প্রায়ই বৃটিশ অফিসারদের সংগে তাঁদের কথা কাটাকাটি মারামারি হতো। শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনী ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পিএসসি হওয়ার পর মতবিরোধের জন্য সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে শিল্প উন্নয়ন সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগে যোগ দেন। নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী; ডিজেল প্লান্ট প্রভৃতির পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৫ সালে সাময়িকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং ৭নং সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নির্ভেজাল হতে বাধ্য। তাঁর এই সাক্ষাৎকার থেকে তিনটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(১) "মুক্তিযোদ্ধা কা'দের অভিহিত করা হবে, সে ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য সর্বজন সম্মত সংজ্ঞা আসেনি, একেকজন একেক রকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।"

(২) "প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দেড় থেকে দু'লাখ, কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রায় ২০ লাখ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।"

(৩) "অনুশোচনা এজন্য যে, আমরা বুঝতে পারলাম এটা ক্ষমতার লড়াই, জনগণের লড়াই নয়, জনগণ ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র। তখন এ কথাটা মনে হলেও করার কিছুই ছিল না।"

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সালে (বুধবার) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (মাহফুজ–কবির) আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ


www.pathagar.com

বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের আমলে তসলিম উদ্দিন, শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমদের স্বাক্ষরে লাখ লাখ মুক্তিযুদ্ধার সার্টিফিকেট অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এসব সার্টিফিকেট দিয়ে অনেকে এসপি, ডিসি হয়েছে। বিতরণকৃত ৩৩ লাখ সার্টিফিকেটের মধ্যে ৩০ লাখই ভুয়া। নিউ ইস্কাটন রোডস্থ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কার্যালয়ে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের মহাসচিব কবির আহমদ খান। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান আবু সাঈদ খান ও আমীন সরোয়ার। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল আলম, নূরুল আমিন, ইউসুফ হারুন, শরীফ উদ্দিন প্রমুখ।

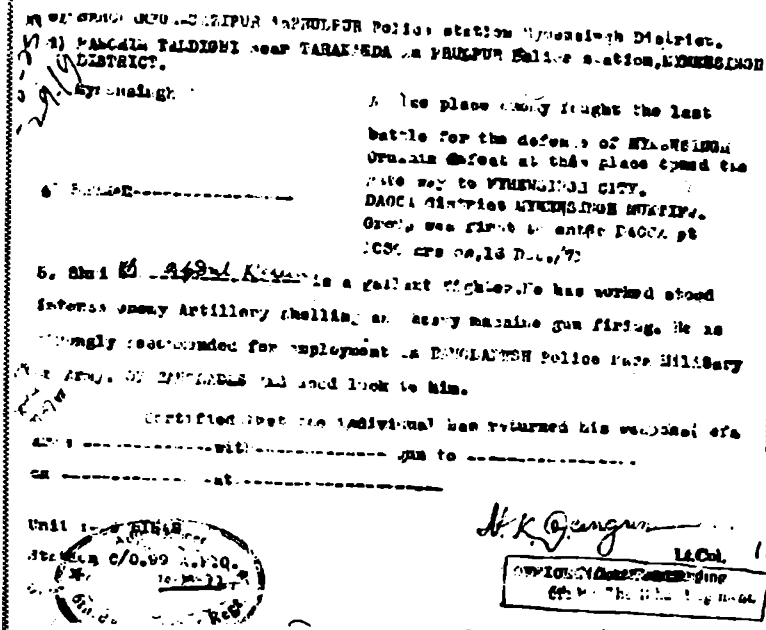
...PUR ...PHULPUR Police station Mymensingh District.
1) ...TALDIGHI near TARAKANDA ...PHULPUR Police station, MYMENSINGH DISTRICT.
3) Mymensingh

The place ... fought the last battle for the defence of MYMENSINGH ... defeat at this place opened the ... way to MYMENSINGH CITY. DACCA District MYMENSINGH ... ... was first to enter DACCA at ... 13 Dec/71

6) ...

5. Shri ... is a gallant fighter. He has ... stood intense enemy Artillery shelling and heavy machine gun firing. He is strongly recommended for employment in BANGLADESH Police ... Military ... Army. ... look to him.

Certified that the individual has returned his weapons ... arms ... with ... gun to ... on ... at ...

Unit ...
Station C/O 99 A.P.O.

N. K. Gangu...
Lt.Col.
Officer Commanding

মুক্তিযোদ্ধার এমনি ভুয়া সার্টিফিকেট



www.pathagar.com

পেনিসিলিনের 'লাখ' দেখা যায় না, চিকিৎসাবিজ্ঞানের যন্ত্রের দ্বারা শুধু পরিমাপ করা যায়। একজন রোগী লাখ লাখ পেনিসিলিন দেহে নেয়ার পরও দেখা যায়, একগ্রাম ওজনও বাড়েনি। পুঁথিতেও পাঠ করা হয়, 'লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার, হিসাব করিয়া দেখি চল্লিশও হাজার।' আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ নিহত হওয়ার সংখ্যা, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত হানির সংখ্যা; আর মুক্তিযোদ্ধাদের ৩৩ লাখের সংখ্যা পেনিসিলিনের লাখের মতোই মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধের এসব কল্পিত সংখ্যাকে ভিত্তি করে মিথ্যা কথার তুবড়ি তারা হরহামেশা মারছে। এসব পরিসংখ্যানই যে নির্জলা মিথ্যা, এতসব প্রমানের পরও কি কোন সন্দেহ থাকে। মিথ্যাচারের এই ব্যাধি থেকে নিরাময় করতে হলে তাদের দেহে পেনিসিলিনের লাখ লাখ ওষুধ প্রবিষ্ট করাতে হবে; আর লাখে লাখে হিসাব কষেও যে চল্লিশ হাজার হয়, সেই পুঁথি তাদের বার বার পাঠ করতে দিতে হবে, তাহলেই হয়তো মিথ্যার এই পর্দা দূর হতে পারে।

আমার আর একটি প্রশ্ন, নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা আওয়ামী লীগ তার সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে কি নিরূপণ করতে পরতো না? জনাব জিয়াউর রহমান কি তাঁর ৬ বছরের শাসনামলে এই কাজটি করতে পারতেন না? জনাব হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদও কি ইচ্ছা করলে ৯ বছরের মধ্যে এই কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন না? মোহতারেমা খালেদা জিয়াও কি তা করতে পারেন না? প্রতিটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, শহরের ওয়ার্ড কমিশনারের সহযোগিতায় কি তা করা যায় না? অবশ্যই করা যায় এবং খুব সহজেই করা যায়। এমন কি ভোটার তালিকা বা আদমশুমারীর সময়ও এ কাজ করা যায়। বড় বড় রাজনেতিক দলও নিজ নিজ উদ্যোগে তা করতে পারেন, এমন কি বেসরকারী উদ্যোগেও করা যায়, কিন্তু তা করা হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না?


www.pathagar.com

এর জবাব হতে পারে দু'টি। প্রথম জবাব হচ্ছে এই, কি দরকার নতুন ঝামেলায় হাত দেয়ার? হাছামিছা যাই হোক, সংখ্যা তো একটা আছেই। তাই চলুক না। কত মিথ্যাই তো দেশে চলছে, এত মিথ্যা যদি চলতে পারে, তাহলে এই মিছিলে আর দু'চারটা মিথ্যা চলতে কেন পারবে না?

দ্বিতীয় জবাব বা কারণ হচ্ছে এই, ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে একজন এম পি বক্তৃতার সময় ভীষণ আবেগময় মুহূর্তে বলে ফেললেন, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ কোটি লোক প্রাণ হারিয়েছে, আমাদের জনগণের ত্যাগের কথা একবার চিন্তা করুন।" একজন শুধরিয়ে দিয়ে বললেন, ৩০ কোটি নয় ৩০ লাখ। বক্তা তখন আবেগে অধীর। তিনি বললেন, 'রাহেন আপনার সংশোধনী, কইছি তো কইছিই।'

অতএব, তিরিশ লাখ সংখ্যাটি 'কইছি তো কইছিই' -এর মত, চলছে তো চলছেই।



www.pathagar.com